KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন, 202 রাসবিহারী এভিনিউ
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 12/2 15/2 15/3 17/2 18/2	Year of Publication : Dec 1946 March 1950 (বৈশাখ ১৩৫৭) Dec 1952 Feb 1954
	Condition : Brittle✓ / Good✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু

দ্বিতীয় সংখ্যা
অষ্টাদশ বর্ষ

কলিকাতা-৭০০ ০০১

কবিতা

পৌষ ১৩৬০

অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, যুগান্তর চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা সরকার, হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ ভট্টাচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শামসুর রাহমান, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, প্রণব মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, নরেশ গুহ, Jessica Lewis, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু

বিদেশী কবিতা অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু

প্রবন্ধ

মার্কিন প্রবাসীর পত্র : অমিয় চক্রবর্তী

সমালোচনা

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে পাঁচ টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। ষান্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহকনম্বরের উল্লেখ আবশ্যক। ঠিকানা পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার অনুলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,

কলকাতা ২৯

বিষ্ণু দে-র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' গ্রন্থে তাঁর কাব্যপ্রতিভার আশ্চর্য বিবর্তন লক্ষণীয়। সিগনেট প্রেসের বই। দাম আড়াই টাকা।

সিগনেট বুকশপ

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট | ১৪২-১ রাসবিহারী এভিনিউ

কবিতা-র বিশেষ সংখ্যার সূচী

বৈশাখ, ১৩৪৫ : (প্রবন্ধ সংখ্যা)

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাস। ৩. বাংলা মিলের দুরূহ তত্ত্ব : অজিত দত্ত। ৪. বাংলা কবিতা : সমর সেন। ৫. স্বগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ৬. কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য : আবু সয়ীদ আইয়ুব। ৭. কবি ও তার সমাজ : বুদ্ধদেব বসু। ৮. সম্পাদক-সমীপে : বিষ্ণু দে। ৯. আধুনিক বাংলা কবিতা : লীলাময় রায়। ১০. কবিতার অনুবাদ : হম্‌ফ্রি হাউস। ১১. কবিতা ও অনুবাদ : হুমায়ুন কবির॥ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪)

কার্তিক, ১৩৪৭ : (প্রবন্ধ সংখ্যা)

১. আধুনিক বাংলা কবিতা (বিখ্যাত সংগ্রহগ্রন্থের সুদীর্ঘ আলোচনা) : অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২. রবীন্দ্র-রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড, নদী, চিত্রা, বিদায় অভিশাপ, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, ভারতবর্ষ ও চারিত্র পূজার আলোচনা) : বুদ্ধদেব বসু। ৩. ঝর্ণাছন্দের কাব্য (সমর সেনের 'গ্রহণ' কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনা) : অমিয় চক্রবর্তী। ৪. প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('সম্রাটের' আলোচনা) : সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ৫. নতুন বই (রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা') : বুদ্ধদেব বসু॥ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০)

আষাঢ়, ১৩৪৮ : (রবীন্দ্রসংখ্যা)

১. সাহিত্য-বিচার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. রবিকাকার গান : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. রবীন্দ্রপরিচয় : প্রমথ চৌধুরী। ৪. পূর্বস্মৃতি : ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী। ৫. আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ : অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ৬. বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৭. রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৮. রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায়। ৯. রবীন্দ্রনাথের ছবি : যামিনী রায়। ১০. ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ : প্রমথনাথ বিশী। ১১. রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি : অমিয় চক্রবর্তী। ১২. রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন : অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৩. রবীন্দ্রনাথ ও মানবধর্ম : হুমায়ুন কবির। ১৪. রবীন্দ্রকাব্যের দৃশ্যপট : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৫. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : জ্যোতির্ময় রায়। ১৬. রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ১৭. রবীন্দ্রনাথের ছন্দ : অজিত দত্ত। ১৮. রবীন্দ্রনাথের নাটক : প্রভু গুহ ঠাকুরতা। ১৯. সুরকার রবীন্দ্রনাথ : হিমাংশুকুমার দত্ত। ২০. রবীন্দ্রনাথের গান : বুদ্ধদেব বসু। ২১. আরোগ্য (কবিতা) সুধীরচন্দ্র কর। ২২. রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২৩. রবীন্দ্রনাথের নতুন বই (রোগশয্যায়, আরোগ্য : বুদ্ধদেব বসু। তিনসঙ্গী : জ্যোতির্ময় রায়)। ২৪. সাহিত্যের মূল্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬)

(এই সংখ্যাগুলির পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন)

কবিতা

পৌষ ১৩৬০
অষ্টাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৭৬

ফনের দিবাস্বপ্ন

(মালার্মে-র ফরাসী অবলম্বনে)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ওই অপ্সরীরা, মন চায় ওদের চিরায়ু দিতে॥

কী স্বচ্ছ ওদের কান্তি, আবহের পুঞ্জিত গ্লানিতে
ভাসে যেন উর্ণাজাল॥

ভালোবেসেছিলুম তবে কি
স্বপ্নকেই ?

প্রর্তক, প্রাক্তন রাত্রি, সাঙ্গপ্রায়, দেখি,
সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায়, অবশিষ্ট বাস্তব বনানী
জানায় নির্জনে যাকে জয়শ্রীর অর্ঘ ব'লে মানি,
তার আখ্যা অনুরাগ গোলাপের স্বভাবদোষেই॥

তবু ধরো……

সে-বরকিশোরীদের পরিচয় এই
হয় যদি যে তারা তোমারই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান
পরিণত সচিত্র পুরাণে! বিনির্গত ওই ধ্যান
আপাতকুমারী প্রথমার, সাশ্রু নির্ঝরের মতো,
ইন্দ্রনীল, হিম নেত্র থেকে : পক্ষান্তরে ক্রমাগত

দীর্ঘশ্বাসে দ্বিতীয়া কি স্মরণে আনে না দ্বিপ্রহরে
উত্তপ্ত হাওয়ার স্পর্শ রোমশ শরীরে ! কিন্তু অরে
মূর্ছাপন্ন স্নিগ্ধ অহনার পরাবর্তী চেতনাকে
পিষে পিষে মারে যে-নিস্তব্ধ অবসাদ, সে-বিপাকে
আমার বাঁশিই শুষ্ক কুঞ্জে দ্রব সুর ঢালে ; আর
একমাত্র বায়ু রেখারিক্ত চক্রবালে প্রেরণার
প্রকট, কপট, শান্ত প্রাণ যা আমার বেণুরবে
প্রত্যুৎপন্ন, পরিকীর্ণ নির্জলা বৃষ্টিতে, তথা নভে
অধুনা পুনরারূঢ় ॥

সিসিলির নিস্তরঙ্গ হ্রদ
যার তটে তটে আমি সবিতার প্রতিযোগী মদ
ধর্ষণে করেছি ব্যয়, হতবাক্‌ তুমি বিকসিত
স্ফুলিঙ্গের নিচে, বলো—"এখানেই ছিলুম ব্যাপৃত
"আমি প্রতিভাপালিত ফাঁপা নল কাটায়, যখন
"দূরের শ্যামল উৎসে সমর্পিত দ্রাক্ষার হিরণ
"অন্তনিভ শুভ্রতার অবিচল ঊর্মিতে উতলা
"হয়েছিল আচম্বিতে : কিন্তু যেই বাঁশরীর গলা
"ফুটেছিল বিলম্বিত আলাপে, অমনই পাখসাটে
"মরালের ঝাঁক শূন্যে মিশে গিয়েছিল, না বিরাটে
"জলকন্যকারা ফিরেছিল ডুবসাঁতারেই......"

জ্বলে
জড়জগৎ প্রখর প্রহরের তাম্র তাপে : স্থলে,
জলে, অন্তরীক্ষে অপর্যাপ্ত সেই কৌমার্যের লেশ
নেই, এমনকি নেই শিল্পসার সে-ষড়্‌জের রেশ,
যার অনুসন্ধানেই পলাতকাদের রূপকার
হারিয়ে ফেলেছে আজ ; আমি উন্মাদনায় আবার

নিজেকে জাগিয়ে তবে, পুরাতন আলোকের বানে
দাঁড়াব একেলা, ঋজু, হে পদ্মিনী, অপাপের ভানে
তোমাদেরই অন্যতম ॥

যে-মূক চুম্বনে থেমে যায়
অনুলাপী অধরের প্রলাপরটনা, স্বস্তি পায়
বিশ্বাসহন্ত্রীরা, ততোধিক রহস্যনিগূঢ় ক্ষত—
অমর্ত্য দন্তের সাক্ষ্য—অথচ আমার অনাহত
বক্ষে স্বাক্ষরিত ; কিন্তু থাক বাক্যব্যয় ! সমুদার
যুগল বেতসই শুধু হেন মন্ত্রগুপ্তির আধার :
বিবিক্তির মর্মবাণী, পরিণত তারই দীর্ঘ সুরে,
নীলিমাকে স্বধর্ম ভোলায় ; প্রতিবেশে যায় ঘুরে
রূপসীর মাথা, আত্মগত সঙ্গীতের নায়িকা সে
ভাবে আপনাকে, যদিও প্রকৃতপক্ষে, প্রতিভাসে
প্রত্যক্ষ উরুর কিম্বা পৃষ্ঠাদির রূপান্তর ক'রে,
বিশ্রম্ভের আস্থায়ী-অন্তরা যেমন অমর ম'রে,
তাকে মেনে সার্থক তেমনই একতাল ওঙ্কারের
প্রতিধ্বনিপ্রহত অভাব ॥

তবে ফুটে ওঠো ফের,
হে যন্ত্রস্থ পলায়ন, পিশুন সিরিংস্‌, পুনরায়
স্ফূর্তির প্রয়াস পাও ইতস্তত বিতত জলায়
যেথা তুমি আমারই প্রতীক্ষা-রত ! আমি জনরবে
অলজ্জিত, কাটাব অমেয় কাল দেবীদের স্তবে ;
কৃতবিদ্য প্রতিমাপূজায়, একাধিক বৈদেহীর
মেখলা খসাব : যেমন সন্তাপ ভুলে আমদির

বিবর্তবাদেই, আঙুরের শোষিতপ্রসাদ ত্বকে
ফুৎকার ভরেছি, এবং প্রচুর হেসে, অপলকে,
মাতাল তৃষ্ণায়, সারা বেলা তাকিয়ে থেকেছি, তুলে
ধ'রে মহাকাশে ভাস্বর নির্মোক ॥

স্মৃতির পুতুলে

এসো, হে অপ্সরীবৃন্দ, প্রাণবায়ু ফুঁকি। "নলবন
"চিরে চিরে, আমার চাহনি বিঁধেছিল অতুলন
"তাদের গ্রীবায় যার জ্বালানিবারণে দিগ্বধূর
"দল ঝাঁপ দিয়েছিল লহরীতে, নির্লিপ্ত, নিষ্ঠুর
"শূন্যে আরণ্যক আর্তনাদ হেনে ; এবং অচিরে
"কুন্তলের মুক্ত ধারা হীরকের মথিত মির্মিরে
"বিভাব হারিয়েছিল! আমি ছুটেছিলুম সে-দিকে ;
"কিন্তু পা, উচট লেগে, থেমেছিল যেখানে, সখীকে
"বাহুক্ষেপে বেঁধে, সখী (সম্ভাবিত অনৈক্যে আহত)
"অঘোরে ঘুমিয়েছিল। আনিনি বিয়োগ করগত
"সে-অদ্বৈতে ; ছায়াবিড়ম্বিত এই গোলাপবিতানে
"নিয়ে এসেছিলুম তাদের, যাতে দিনেশের টানে
"বীতগন্ধ ফুলের মতোই, আমাদের উচ্ছ্বসিত
"রতিপরিমল উবে যায় দিবাশেষে"। বলাৎকৃত
কুমারীর ক্রোধ, উলঙ্গিনী উন্মত্ত রভসে শুচি,
পিপাসিত অধরের তপ্ত স্পর্শে যেন বররুচি
বিদ্যুতের স্খলিত বিলাস ভালোবাসি, ভালোবাসি
আমি আতঙ্কের সংবৃতি শরীরে—হোক তা উদাসী
প্রথমার পদান্তে বা দ্বিতীয়ার দুরুদুরু বুকে :
উভয়ে সমান তারা নষ্ট অনভিজ্ঞার অসুখে,

একজন আত্মহারা যদিচ ক্রন্দনে ও অপরে
মাত্র বাষ্পাকুল। "আমার মহাপরাধ, দৈব বরে
"যে-চুম্বন একাকার তথা আলুথালু, জয়োল্লাসে—
"যেহেতু তাদের ভয় ভেঙেছিল আমারই প্রয়াসে—
"সে-সহযোগের জোট আমি চেয়েছিলুম ছাড়াতে।
"কারণ উদ্দীপ্তকাম জ্যেষ্ঠার সংক্রাম কনিষ্ঠাতে
"দেখা দূরে থাক, অগ্রবর্তিনীর গভীর আহ্লাদে
"যেই নিবাতে গেলুম আমার দীপক হাসি, সাধে
"আর সাধ্যে তৎক্ষণাৎ বিবাদ বাধাল বিধি : শ্বেত
"পালকের মতো অলজ্জ, সরল অনুজা সঙ্কেত
"থেকে পলাল সে-সুযোগে, আমার অঙ্গুলি ছিনিয়ে ;
"সঙ্গে সঙ্গে, গদ্‌গদ নির্বন্ধে কান পর্যন্ত না দিয়ে,
"কৃতঘ্ন শিকার খণ্ডাল শিথিল কণ্ঠাশ্লেষ" ॥

যাক

যা যাবার ; অনাগত সুন্দরীরা ভরাবে এ-ফাঁক,
জড়িয়ে আমার শৃঙ্গে কেশপাশ, আরামে তরাবে :
স্বসমুখ আদিরসে অলিদের মুখর করাবে
আমার বাসনা—স্ফুট, নীলারুণ, সুপক্ক ডালিম ;
এবং যে-পরিপ্লুতি আমাদের শিরায় রক্তিম,
তার নিত্য নির্বিশেষে ধার্য নয় কে বসন্তসেনা।
কুঞ্জকে ছোপায় যবে ধূসরিত গোধূলির হেনা,
তোমার উৎসব, এট্‌না, নির্বাপিত পাতায় পাতায়
অন্তরিত হয় সে-সময়ে, আসে অমায়িক পায়
স্বয়ং ভীনাস্, পেরিয়ে লাভার প্রস্থ, অকস্মাৎ
নীরবের বজ্রনাদে ঘটে খিন্ন বহ্নির নিপাত।
ধরি ভুজে অপ্সরীরাজ্ঞীকে ॥

হা, শান্তি অনপনেয়......

কিন্তু বাক্যবিমুক্ত হৃদয়, তথা গুরুভার দেহ
হার মানে শেষে মধ্যাহ্নের উদ্ধত মৌনের কাছে :
আর নয় দেবনিন্দা ; স্মরণের আনাচে কানাচে
তন্দ্রা জমে ; পাতি শয্যা তবে রুক্ষ বালুতে এ-বার,
এবং সুরার জন্মপত্রে যে-গ্রহ প্রবল, তার
নিচে শুই, যথারীতি মুখ খুলে !

যমলা, বিদায় !
আমাকে সে-ছায়া ডাকে, তোমাদের লুপ্তি যে-দ্বিধায় ॥

ভাষ্য

অর্ধছাগ, অর্ধদেবতা, রোমক পুরাণের ফন্, ভারতীয় কিন্নরদের মতোই সঙ্গীতবিলাসী। কিন্তু তারা গায়ক নয়, বেণুবাদক ; এবং হয়তো তাই, যেমন আমাদের মুরলীধর, তারাও তেমনই লাম্পট্যের প্রতিমূর্তি। কারণ তাদের অগ্রনায়ক প্যান্-এর অনুধাবন থেকে বাঁচার অন্য পথ না পেয়ে, সিরিংস্-নামক অপ্সরী একদা বেতসের রূপ ধরেছিল ; এবং উক্ত নলেই ফন্-সম্রাটের প্রথম বাঁশি নির্মিত। অবশ্য মালার্মে-র মৃত্যু মনোবিকলনের প্রাগ্বর্তী। তাহলেও অলোকসামান্য অনুব্যবসায়ের আশীর্বাদে তিনি প্রায় এক শতাব্দী আগে—যখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশের নিচে, তখনই—অনুমান করেছিলেন যে সৌন্দর্যবোধ রিরংসার উদ্গতিমাত্র ; এবং সেই জন্যে ফন্-এর দিবাস্বপ্নে প্রত্যক্ষ উরু ও পৃষ্ঠ ধ্বনিসর্বস্ব কবিতার একতাল ওঙ্কারে পরিণত। নন্দনতত্ত্বের আর কোনও ব্যাখ্যায় আস্থা রাখলে, শোষিত আঙুরের নির্মোকে

ফুৎকার ভ'রে সারাদিন সে-ভাস্বর গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে, তৃষ্ণানিবারণ তার সাধ্যে কুলত না ; এবং বৌদ্ধ না হয়েও, সে কায়মনোবাক্যে মন্ময় শূন্যবাদ মেনে নিয়েছিল ব'লেই, সন্ধ্যার তন্দ্রাবেশেও তার আত্মশ্লাঘা ফুরয়নি, তার সর্বশক্তিমান অহঙ্কারের অগ্নিগিরি ভীনাস্-কে গ'ড়ে, আবার আপনার বজ্রনির্ঘোষ মৌনে তলিয়ে গিয়েছিল। নায়িকাযুগলের প্রসঙ্গেও অনুরূপ মন্তব্য সম্ভব ; এবং পৃথক ভাবে তাদের মধ্যে বাঁশরী ও প্রেরণা, বেদনা ও ভাবনা, ইত্যাদির যোগাযোগ দেখি বা না-দেখি, প্রাকৃত অদ্বৈতের ব্যবচ্ছেদই নায়কের স্বীকৃত মহাপরাধ।

পক্ষান্তরে মালার্মে প্রতীকী কাব্যের পুরোধা ; এবং প্রতীকের সঙ্গে রূপকের প্রভেদ আকাশ-পাতালের চেয়েও বেশী। অর্থাৎ প্রতীক স্বতঃসিদ্ধ রূপের কৈবল্য আর রূপক ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক ; এবং মালার্মে কবিতাকে রিক্তগর্ভ সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েই থামেননি, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের বিশেষ বর্ণমালা কাব্যরচনায় অনুকরণীয় নয় ব'লে, তিনি একাধিক বার আক্ষেপ করেছিলেন। উপরন্তু তিনি জানতেন যে সমসাময়িকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র খাঁটী কবি ; এবং আজীবন তিনি যেহেতু অধ্যাপনার দ্বারা অগত্যা গ্রাসাচ্ছাদনের দাবি মিটিয়েছিলেন, তাই বোধহয় লোকশিক্ষার নামে তাঁর গায়ে জ্বর আসত। অবশ্য গদ্য টীকায় কবিতার মর্মোদ্ঘাটন যে পাপের পরাকাষ্ঠা, এ-বিশ্বাস তাঁর নয়, তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য ভালেরি-র। কিন্তু তাঁর কাব্য নিকামত রহস্যঘন ; এবং সেই প্রাণস্বরূপ রহস্যের রক্ষায় তাঁর জটিল চিত্রকল্প অবিচ্ছেদ্য, তাঁরা ভাষা ব্যঞ্জনামূলক শব্দের ধাতুগত প্রয়োগে দুরূহ, তাঁর অভিপ্রায়, ব্যাকরণ মানলেও, অন্বয়ের শাসন মুক্ত। তৎসত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে অন্তত প্রথম সংস্করণে "ফন্-এর দিবাস্বপ্ন" আবৃত্তির জন্যে লিখিত ; এবং জীবদ্দশায় সে-সাধ পুরতে না পেরে, কবি যদিও নিরন্তর সংশোধনে অভিনেয় কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত ধ্যেয় স্বগতোক্তির পর্যায়ে তুলেছিলেন, তবু যে-বৈনাশিক এ-নাটকের মুখ্য পাত্র, তার অনন্য নির্ভর ঘটনাপরম্পরা, অথবা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ—উজ্জ্বল ও অবশ্যস্বীকার্য হলেও, প্রতীক, যার ও-দিকে অনিশ্চয় আর এ-দিকে বেদনাপ্রভব কল্পনা।

অন্ততপক্ষে আমরা যারা দর্শক, উত্তম পুরুষের অন্তরলোকে আমাদের প্রবেশ স্বভাবত নিষিদ্ধ ; এবং তার হাব-ভাবে দৃষ্টি রেখে, তথা উক্তিতে কান পেতে যত রকম বিবরণ লেখা সম্ভব, তার একটা এই : ফন্-দের শ্রীক্ষেত্র সিসিলি-র এক উপবনে একজন মধ্যবয়সী ফন্, মধ্যাহ্ননিদ্রায় বিভোর হয়ে, দেখছিল অপ্সরীধর্ষণের সুখস্বপ্ন, কিন্তু দিনের তাপ বাঁড়তে, সে আর ঘুমতে পারলে না ; এবং জাগতেই, তার চক্ষে পড়ল শূন্য কুঞ্জের বাস্তব ডাল-পালা। তখন যদিও না-মেনে উপায় রইল না যে তন্দ্রা আসার আগে পারিপার্শ্বিক গোলাপের গন্ধ তার মানসে যে আমোদ জাগিয়েছিল, তাতেই ফুটে উঠেছিল স্বপ্নাখ্য বরমাল্যের আকাশকুসুম, তবু কল্পনাবিলাসকে একেবারে অসার বলতে তার আত্মরতিতে বাধল ; এবং ফলে, উৎপ্রেক্ষার চরমে পৌছে, সে ভাবতে চাইলে যে নিকটে কোনও নির্ঝরের শব্দ, বা শরীরে হাওয়ার তপ্ত স্পর্শ, নায়িকাযুগলকে মনে আনেনি, বরঞ্চ তাদের ভাবানুষঙ্গেই জলকল্লোল ও বায়ুহিল্লোলের উৎপত্তি। কিন্তু এ-বিশ্বাসও টিকল না—আবার চোখ মেলতেই, বোঝা গেল যে, সুন্দরীদ্বয় দূরে থাক, তার প্রতিবেশে জল হাওয়ার চিহ্নও নেই, রুক্ষ নাস্তিতে অভিব্যাপ্ত শুধু বাঁশির দ্রব সুর আর বাদকের দিব্য প্রেরণা, যা, কামিনী কেন, অপ্ ও মরুতের মতো আদিভূতেরও উদ্ভাবক। এমনকি অমায়িক জেনে, দিগন্তের রৌদ্রবিকচ হ্রদে তাকাতেও ভেসে উঠল কেবল অভিজ্ঞান ; এবং সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলাল সত্য-মিথ্যার ব্যাবহারিক ব্যবর্ত।

কারণ সে যেমন না মেনে পারলে না যে সে আদ্যন্ত একা, তেমনই বুকে দংশনের দাগকেও তার অস্বীকার্য ঠেকল ; এবং তার পরে সে বুঝলে যে উভয় উপলব্ধি কার্য-কারণের সূত্রে সম্বদ্ধ। অর্থাৎ শিল্পসামগ্রী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি ; এবং যে-নির্মম অনুপ্রাণনায় রূপকারমাত্রেই নিঃস্ব, তাতে সম্ভবত প্যান্-প্রপীড়িত সিরিংস্-এর অবরোহী অভিসম্পাত সক্রিয়। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস এমনই নিষ্ঠুর যে উক্ত আত্মবলিদানের দুঃখ প্রতিহিংসাপরায়ণ সিরিংস্-কেই নিবেদ্য ; এবং হয়তো তাই, মুখে মাইডাস্-এর নাম না আনলেও, নায়ক ইঙ্গিতে সে হতভাগ্যের উল্লেখ করেছে।

অবশ্য ফ্রিজিয়া-রাজ, প্যান্-অ্যাপলো-র সঙ্গীতপ্রতিযোগে প্রথমের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে, শেষোক্তের শাপে যে লম্বকর্ণ হয়েছিলেন, তা তিনি নিজে রটাননি ; এবং তাঁর নাপিত সে কথা শুনিয়েছিল কেবল মাটিকে। কিন্তু যত্নে বোজানো গর্তে ফুটে উঠেছিল বেতস ; এবং হাওয়ার দৌত্যে রাজার লজ্জা পৌছেছিল প্রজার কানে। অতএব লোকাপবাদখণ্ডনের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় না কাটিয়ে, ফন্ অতঃপর মন দিলে মানসীদের প্রকাশ্য বস্ত্রহরণে, এবং যখন বলাৎকারের সুযোগ এল, তখনও সে শিকারসমেত বনান্তরালে লুকল না, সাক্ষী ডাকলে দ্বিপ্রহরের সূর্যকে। সেই অবৈকল্য সত্ত্বেও, চূড়ান্ত সিদ্ধি কেন তার ভাগ্যে জুটল না, সে-প্রশ্নের উত্তর সে আপনার মধ্যেই পেলে ; এবং মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যে-সোহংবাদে শেষ পর্যন্ত সে চোখ বুজলে, তার ভাষ্য লিখে গেছেন শঙ্করাচার্য।

অবশ্য অদ্বৈতবাদে মালার্মে-র গুরু শঙ্কর নন, হেগেল্। কিন্তু অনেকে যেমন ভাবেন যে শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৈনাশিক, তেমনই হেগেল্-এর বিচারে বিশুদ্ধ সত্তা আর নির্বিকার নাস্তি তুল্যমূল্য ; এবং তাঁর শিষ্য মালার্মে-র কাছেও তাই একর্বির হিরণ্ময় পাত্র মোহময়। তবে ক্রোচেও হেগেল্পন্থী ; এবং তিনি ভাব ও ভাষার প্রভেদ মানেননি। সুতরাং "ফন্-এর দিবাস্বপ্ন"-এ ঈশোপনিষদের রহস্যারোপ হাস্যকর ; এবং হয়তো তার চেয়েও বেশী পণ্ডশ্রম উক্ত ফরাসী কবিতার বঙ্গানুবাদ। কারণ কবি হিসাবে মালার্মে শুধু বিভিন্ন এমনকি বিপরীত আবেগের আস্রবণ, অথবা অস্মোসিস্, ঘটিয়েই ক্ষান্ত নন, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকল্প যে-রকম বহুলাঙ্গ বাক্যের মুখাপেক্ষী, তার অনুকরণ স্বভাবনিগ্রন্থ বাংলায় একেবারে অসম্ভব ; এবং স্বয়ং অল্ডাস্ হাক্স্লি বর্তমান কবিতার ইংরেজী তর্জমায় ও পরিবর্জন পরিবর্তন—এ-দুটো দোষের কোনওটা এড়িয়ে যেতে পারেননি। অবশ্য রজার ফ্রাই-এর অনুবাদ আক্ষরিক। কিন্তু শাল্ মোরঁ-র টীকাব্যাতিরেকে তা প্রায় অবোধ্য ; এবং মোরঁ আর মালার্মে-র শ্রেষ্ঠ জীবনীকার আঁরি মঁদর-এর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র বোধহয় অবিমিশ্র সমালোচনার প্রবর্তক আল্বের তিবোদে-র প্রতি তাঁদের গভীর অবজ্ঞা, যদিও গুরুভক্ত ভালেরি আবার শেষোক্তের পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে,

প্রতীক ব'লেই, মালার্মে-র কাব্য সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত অনিবার্য, এবং তিনি কার্যতও দেখিয়ে গেছেন যে কবির সঙ্গে যে-ফুলের কারবার তার বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, আকার নেই, আছে কেবল প্লেটো-পরিকল্পিত রূপ।

পাগলা জগাইয়ের গান

অমিয় চক্রবর্তী

"স্পষ্ট বেসুরে একা বসে গান গাই
ক্ষুব্ধ তানসেনি তানে তা-না-না-না,
কেননা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই
(তোমরাও দেখো, নয় তো চক্ষু কানা)
গানের বক্তব্য প্রধানত আজ
চতুর্দিকের সঙ্গে বিদ্রোহ ;
পুরোনো সাম্রাজ্যের বরকন্দাজ
যখন নতুন মন্ত্রীর সমারোহ
স্বাধীন স্বদেশের বুকে গুলি চালিয়ে
বাদামী বণিকের তন্ত্রে রাখে বজায়,
একটু স'রে এসে (দূরে পালিয়ে)
খানিকক্ষণ অন্তত থাকি মজায় ;
প্রসিদ্ধ ঘরানা এখনো আছে জানা
তাই দিয়ে গাই তা-না, না, না ॥

"ত্যাগরাজ বা নতুন যদু ভট্টের
শাক্‌রেৎ না হয়েও ক্লিষ্ট প্রাণে
যেটুকু ঠাট আছে তাতে শঠ্যের
উত্তর দিতে পারি খরতানে।
যদিও কণ্ঠ যায় ভিগিতে শুকিয়ে
ভাঙা বাংলার কথা ভেবে ভেবে :
সীমান্তের নদীপেরিয়ে রোজ লুকিয়ে
পাসপোর্ট-হারা দল আসে নেবে,

ষ্টীমারে রাস্তায় হা-ঘরে হয় মরে,
কলকাতার শান-বাঁধা ফুটপাথে
অন্তিম অধিবাসী ঘুরে পড়ে
মোটর বিলাসীর আস্তানাতে—
তখন কালো-বাজারির রক্তচোখ দিলে হানা
নির্লজ্জে গাই তা—না—না—না ॥

"যে-আশ্চর্য দেশে সুখনীল শরতে
আপনিই সানাই বাজে আকাশে
তারি শুকনো মাটিতে, শূন্যের পরতে-পরতে
ভিখারীর কান্না জাগে বাতাসে।
ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল একদিকে
অন্যত্র দেখো কালিঘাট :
রুচির ধর্মের মোক্ষ নাও শিখে
স্বয়ং স্বর্গীয় বুকে কবাট।
অথচ কোটি লোক তারি মধ্যে হাঁটে
একটিও কথা কয় না বিরোধে,
ধার্মিক তিলক কাটে ললাটে
অধার্মিক এড়িয়ে চক্ষু মোদে ;
বলির নরস্ত-বধ চলেছে একটানা
উর্ধ্বে তাই মাথা নেড়ে বলি তানানানা ॥

"এমন সময় যারা স্বভাবত
রচত কবি-গান, দোহা, হেঁয়ালি
নিতান্ত অস্তিত্ব সুখের অভাবত
নিভেছে তাদের বাক্য-দেয়ালি।

ময়নামতীর সেই দূর কাহিনী
নব্যের ঘরে ঘরে ফিরে মেশানো,
বৈদিকে আধুনিকে প্রাণবাহিনী
সুফি-বৈষ্ণবী গেঁথে মন নেশানো
ছিল আমাদেরো গান-বাঁধা দখলে ;
নতুন দুনিয়ার আলো নিয়ে বাঁচি,
তবু ভাঙা তবলা বাজিয়ে দেখ সকলে
মরিয়া হ'য়ে জানাই বেঁচে আছি—
অন্তত সামনে এলে দৈবজ্ঞ জাত-মানা
তুড়ি দিয়ে গাই তা—না, তা-না-না-না ॥

"তারো বেশি, দল বাঁধতে নাচতে জানি,
মূর্ছার রাজ্য পেরোই কিম্বদন্তী ;
চীন-পশ্চিম-আফ্রিকার তাজা বাণী
দ্রিম দ্রিম বাজাই বৈজয়ন্তী—
গান্ধীর শান্তি-অক্ষৌহিণী মন্ত্রে
রুধি বোমার দুর্বল উপাসক,
অখণ্ড হিন্দ্-পাকিস্তানি যোগ তন্ত্রে
ঠেকাই সাম্প্রদায়ী ভিন্নের পোষক।
এসো যোগ দাও জগাইয়ের যাত্রায়
আউল বাউল কীর্তনী কোরানি,
নরোত্তম পালায় মাতো অতি মাত্রায়
মূর্খ ভক্তের মাথা-ঘোরানি—
জাগিয়ে পাড়া জগা পাড়ি দেবে অঠিকানা
ততক্ষণ ঠারে ঠোরে গায় না-তা, না-তা, তানানানা ॥"

যামিনী রায়ের এক ছবি
(পটলের জন্য)

বিষ্ণু দে

কেবলই কি লয় কাটে? জাগে মরণের মরুভূমি?
মাথার রুপায় ঢাকে হৃদয়ের স্বর্ণঘটে সোনা?
সদা ভয় কে যে যায় সে কি আমি অথবা সে তুমি,
তাই রাত্রি হিরণ্ময় তাই দিনগুলি জোড়ে বোনা?

আকাঙ্ক্ষার সূর্যোদয়ে মেলে না কি সন্ধ্যার আরতি?
তোমার আমার গানে প্রেম-মৃত্যু বিবাদী মূর্ছনা
একাকার, কৈলাসে যেমন এক উমা আর সতী—

এ দ্বন্দ্ব ব্যাপ্ত যে সারা জীবনেই, গঙ্গা আর গোবি।
চোখে কানে ভ'রে দেয় ঘ্রাণে-ঘ্রাণে প্রকৃতি সুন্দর,
অথচ সমাজে জীর্ণ স্ববিরোধে অপ্রাকৃত ক্ষতি,
অথচ কুৎসিত গ্রাম শহরের জীবন বর্বর!
প্রকৃতি বৃথাই গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর
চোখের ধূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি।

ত্রিকালের তিনতালে গড়ো তুমি একটি ভৈরবী।

প্রাণশিল্প

যুগান্তর চক্রবর্তী

খোঁপায় দেবো কী ফুলটি
—শিমুল, শিমুল, শিমুলটি,
কালোয় লাল আগুন জ্বলে
কোথায় পাই এ-তুলটি!

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
তোর এলানো চুল ঝড় হ'ল যে
হাতের তাপ পেয়ে!

সাজাই কিসে ও অঙ্গ
—তরঙ্গ সে, তরঙ্গ
অতল তার চূড়ায় নাচে
সমুদ্রের কী রঙ্গ!

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
আমি প্রতিটি দিন স্বচ্ছ হই
সেই সাগরে নেয়ে!

অধরে দেবো যে সৌরভ
ফুলেরও নেই সে গৌরব,
কথায় কাঁপা স্বপ্নে ফোটে
তারার নীল কী উৎসব!

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
আমি মনের সাত পাপড়ি খুলি
স্পর্শ তার পেয়ে!

মন যে দেবো, কোথায় মন
দিনের দাহে কী মন্থন,
রাত্রে তাই পাথর ভেঙ্গে
একটি মুখ গড়ার পণ।

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
সেই ভুবন আমি দেখি যে তোর
চোখের দিকে চেয়ে॥

ভাদ্রপদা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কেন আর বিলসিত কর বা হৃদয়
কেন এই করুণা বা দয়া?
যা দেবার একদিন তিক্ত ব্যথাময়
প্রেমে দিয়ে গেছি অনশয়া।

তুমি শুধু নিতে জানো দাও না কিছুই
কবে কোন্ যুগ থেকে সুরু!
আমার কী সাধ্য আছে তোমারে যে ছুঁই?
সর্বদাই বুক দুরু দুরু।

চিঠিতে কি মুছে যাবে ললাট-লেখন
আখরের স্রোতে যাবে ধুয়ে?
আমি কি জানিনে মনে তোমার এখন
শান্ত মন কী শয়নে শুয়ে?

কী চাও এ চিঠি দিয়ে, প্রণামী আবার?
মৃত দিন জাগে কি কখনো!
আমি আর মেঘ নই নিয়ে জলভার
বিদ্যুতে থাকো তুমি মগ্ন।

অভিনয় তৌর্যত্রিক : ঝড়ের আগে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজবেই বুঝি বিকেলের মেয়ে
পরদা দুলছে গ্রীন রুমের
এখনো ক'দিন দেরি আছে বুঝি মন্‌সুনের ?
জ্যৈষ্ঠ-শেষের এত উত্তাপ
পোড়ায় না আদি রক্তের পাপ
প্রথাভীরুতায় মিছে পরিতাপ
স্মরগরলের খণ্ডনের।
এখনো রয়েছে যতটুকু আলো
তা' দিয়ে বানাও অঙ্গলেপ
অঞ্জলি ভ'রে যত সোনা ধরে
আরো যতখানি উব্‌ছিয়ে পড়ে
সে-নির্ঝর
রূপ-বিলেখনে বিচিত্র জলদর্চি মেঘ
তা' দিয়ে বানাও অঙ্গলেপ
স্পন্দিত আলো অস্ত আকাশে
সদ্য গা-ধোয়া শ্লথ বেশ-বাসে
হানুক ঝড় ;
দিগন্তছুট ঝড়ের বেগ আনত হোক
পড়ুক অঙ্গে ইভার আদিম অভিক্ষেপ
দেহ-যষ্টির শাড়ি-বেষ্টনে উন্মীল হোক
অনন্তর।
উড়ে চ'লে গেল ডানা মেলে তার প্রয়াণ
রাখবে কি কোনো নিত্যকালীন অভিজ্ঞান

বিশদ কিংবা দুরধ্যয়
বাঁধা এ মঞ্চে মালঞ্চ মধু জাগায় ভ্রম
সে-অভিনয়—
সে অভিনয়ের যে-সব ক্রম
শুরু ক'রে দিয়ে বাঁধা-ধরা খাতে
গান গেয়ে ওঠে এ সাজঘর।

এখন যদি বা আসেই ঝড়, আসুক ঝড়, দুঃখ কী ?
এখন যদি বা ভিজে মাটি ছাড়ে ঘ্রাণাতিরেক।
তা' নিয়েই এসো বোশেখি মেঘ
তা' দিয়েই বাঁধো মেঘেলা চুল
তা' দিয়েই হানো অমিতবেগ
স্বপ্ন-স্বর।
স্পন্দিত আলো ডুবে শেষ হ'লো
বেধে গেল কী যে হুলুস্থুল
কেঁপে কেঁপে ওঠে এ-সাজঘর।

এখন তাহ'লে ঝিমানো স্নায়ুতে আসুক ঝড়
বল্‌বো তবু তো বিকেলের মেয়ে
করেছিলো কত মায়াবী সাজ
গন্ধ-ছিটানো পরদা দুলেছে গ্রীনরুমের
পাদ-প্রদীপের সমুখে ভেঙেছে কুমারী-লাজ।

এখন সে-সব মণ্ডপ-ভাঙা
নিবেছে সে-বাতি গ্রীন্‌রুমের
অভিনয় পালা শেষ হয় যদি
শুরু হোক লীলা মন্‌সুনের!

স্কেচ

সুস্মিতা সরকার

মেয়েরা দু হাতের আঁজলা ভরে
ক্লান্ত মুখ ধুয়ে নিলো
কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো।
পুরুষেরা তর্জনীর আঁকশিতে
ক্লান্ত ঘাম ঝাড়লো
একটু হাঁ-করা বিরক্ত মুখে।
একটা রুগ্ন কুকুর ধুঁকতে ধুঁকতে
রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে
স্নিগ্ধ ছায়ার কুণ্ডলীর মধ্যে।
কিন্তু ঐ অতোটুকু পাখিটার শরীরে
চলনে-বলনে একটুও ক্লান্তি নেই
ডাল থেকে ডালে উৎসাহিত পায়ে
লাফিয়ে চলেছে—
অফুরন্ত।

দুটি কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

পিয়াল

বেড়াতে বেগুনি ফুল
ঘন লতা সবুজ, সজল।
ঘোলাটে আকাশে দুটি
হাত রেখে দাঁড়ালো পিয়াল।
ঘরেতে এসেছে উড়ে
প্রকৃতির অবোধ চড়ুই।
কথায় অধরা এই
সাধারণ শ্রাবণ-সকাল।

রূপকে, রেখায়, রঙে
ছিলো মনে অশেষ খেয়াল।
সহজে অশেষ কথা
বলো তুমি সবুজ পিয়াল!

জোনাকি

কালো হাওয়াময়
ভাসে নীল টিপ
ভিজে ঘাস-বন
ছুঁয়ে উড়ে যায়।
ওরা কি-যে চায়
ওরা কি-যে পায়!

এলো আকাশের
মাঠে তারাফুল।
নীচে অকারণ
নীল কুয়াশা—
জ্ব'লে নিভে যায়।
ওরা কি-যে পায়!

ওগো ছোটো প্রাণ,
এ কি অগণন
ক্ষণ-রঞ্জন
আনো বাতাসে?

দেখো তারাফুল
হাসে কতোকাল
কালো আকাশে!

ময়ূরাক্ষী

অরুণ ভট্টাচার্য

জল দাও, জল দাও।

সমস্ত পৃথিবী ভরে দুঃস্বপ্নের অনাত্মীয় স্মৃতি
দূর মাঠে শস্যক্ষেত্রে রৌদ্রের নিষ্ঠুর ভালোবাসা
গৈরিক মাটীর গন্ধ, অতিদূর মহুয়ার বনে
কাকচক্ষু আকাশের ছায়া। তারপর
রাত্রি ভোর, শূন্য মাঠে, মাটীতে, নদীতে
একটানা বিলম্বিত স্বর:
জল দাও, জল দাও।

ওপারে নিস্তব্ধ গ্রাম, ঘরে ঘরে মানুষের ছবি,
হ্রস্ব দীর্ঘ জীবনের অন্ধকার পটভূমিকায়
দু-একটি উলুখড়, ভাদ্রের নদীর স্রোতে দুরন্ত, চঞ্চল।
তারপর, আশ্বিনের শেষে
যখন পালকমেঘ লঘুপক্ষ বাতাসের টানে
দূর থেকে দূরে ভাসে,
ইন্দ্রনীল ময়ূরাক্ষী আকাশের নিচে
স্থির হয়ে নিঃসাড়ে ঘুমায়,
তখনো গভীর রাত্রে কারা যেন সমস্বরে বলে:
জল দাও, জল দাও।

এখন প্রহর শেষ। চৈত্রের আড়ালে,
দুরান্তের রাঙামেঘ মাটিকে প্রণাম করে,
যদিও বাতাসে কার কান্নার জোয়ার।
মাঠে মাঠে ছিন্ন শাখা কৃষ্ণচূড়ের উদাস ছায়াতে,
মন্থর বসন্তসন্ধ্যা অনর্থক ঘুরে ঘুরে মরে।
বুঝি না অস্পষ্ট ভাষা, মনে হয় ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
জল দাও, জল দাও।

জানি না অন্তর ভরে এতদিন কী বেদনা ছিল,
জানি না জীবনে কেন এ-তৃষ্ণার ছলছল ঢেউ
সারাদিন মনে জাগে,
ফাল্গুনের দুর্বিনীত স্পর্শে
এ কি এ উদাস সুখ, শরীরে কী তৃষ্ণা অহরহ,
সমস্ত নিঃশ্বাসে যার দুরারোগ্য জরা—
দাক্ষিণ্যে দুরভিসন্ধি ফুলের প্রহার।
নদীতে চাঁদের ছায়া, পাণ্ডুর আকাশে,
ওপারের মাঠময় চাষীদের ক্ষেতের দুধারে
আষাঢ়ের স্বপ্ন ছিল, সে-স্বপ্নের অর্থ আছে জলের রেখায়,
যে-রেখা জলের দাগে কোনোদিন মুছবে না আর,
কোনোদিন মুছবে না জেনে,
তারা যেন আজো বলেছিল।

জল দাও, জল দাও॥

বাঁচলে পরেই

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বাঁচলে পরেই বাঁচে মনের সুর কি?
সরাইখানার হাওয়াখানা উদাসে ভরপুর কি?
অনেক দিনা কাটিয়ে ওঠা, অনেক মনের দ্বন্দ্ব
জীবনসভার বিচারশালায় জমছে ভালো-মন্দ
—এমন সময় কারার কথা পড়ছে মনে আজ কি?

শিউলি-ফোটা সকাল আর চন্দ্রবিহীন রাত্রি
ভাবনাগুলো ফিরছে যেন ক্লান্ত শবযাত্রী।
আষাঢ়শেষের শেষ-সীমানায় কাঁপছে জীর্ণ তারা
চুকিয়ে দিলেই পৃথিবীর এই এতোদিনের ভাড়া
—ভাবছো মনে থাকলো বাকি আর কী!

থাকলো তবু অনেক কিছুই থাকলো হাসিকান্না।
থাকলো পাওয়ার থাকলো চাওয়ার নিভৃত সব কান্না।
জন্ম আছে মৃত্যু আছে আছে আশাভঙ্গ
জোয়ার-ভাটার অস্থিরতা দুরন্ত তরঙ্গ
—তাই তো বলি চাইলে ছুটি আজকে ছুটি পাও কি?

অতি-পুরাতন বৃষ্টি

শামসুর রাহমান

মেঘে-ঢাকা রাত্রি নয়, ভরা দুপুরেই
যখন পরীর মতো গান গেয়ে ওরা আসে এই
বাংলার আকাশ থেকে নিচে
দিগন্তের নীলে ঘাসে দক্ষিণের শান্ত বিলে শহরের পিচে
(ওরা বৃষ্টি অতি-পুরাতন)
দূরের ধূমল পথে নেমে আসে নিমেষে যখন
আমারো প্রাণের ভাষা সুর হয়ে ঝরে
এ মাহ ভাদরে।
আবার তোমাকে পাই হৃদয়ের সৃজনী উত্তাপে :
সমস্ত শরীর হয় দীপ্ত শিখা, অন্ধকারে কাঁপে।

মেঘে-ঢাকা এই ভরা দুপুরের কাছে
হয়তো তোমার কিছু রহস্যনিবিড় কথা আছে
শুধাবার, তাই চোখে অপার বিস্ময়
অরণ্যের মতো কাঁপে, মনের নিঃশব্দ লোকালয়
দূরগামী উত্তরমেঘের
নিত্যপথে ভাষা পায় বেদনার ব্যাপ্ত আনন্দের।

যে-পথে হাঁটিনি আমি কোনোদিন সেখানে এখন
স্তব্ধতার সুরে সুরে নেমেছে বর্ষণ
শ্রাবণের। পথের যে-কোনো একা পাখি-ডাকা গাছ
মহাশ্চর্য মেঘ হয়ে যায় যেন বৃষ্টির ধোঁয়ায়!

পাতায় পাতায়
পরীর দেহের আভা, হাওয়াদের নাচ।
কখনো যাবে না চেনা কে ছিল ঘুমিয়ে
না-দেখা পল্লীর
মাটির দেয়াল-ঘেরা দূর ঘরে স্বপ্ন মুড়ি দিয়ে
এমন বৃষ্টির
আচ্ছন্ন দুপুরে মিশে। পাশে তার কেউ
ছিল না কি জেগে একা রমণীর ঘুমের সৌরভে?

যখন প্রাণের নীল ঢেউ
জেগে ওঠে, কথা বলে, রক্তের আশ্চর্য কলরবে
বৃষ্টির দুপুরে, মনে পড়ে
বর্ষার মতন গাঢ় চোখ মেলে তুমি আছো দু'দিনের ঘরে।

পরদিন রৌদ্রের সকালে
চোখ খুললেই দূরে ভোর লাগা শিরীষের ডালে
পৃথিবীর মুগ্ধ ছবি; মনে থাকবে না
এই চির-চেনা
আপন মাটিতে কাল নেমেছিল আবার আষাঢ়,
আর্তি দু'টি হৃদয়ের—কারো মনে থাকবে না আর॥

কবি

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

(এক)

এই তো মরশুম সবুজ শাহীবাগে
রঙের ঝড় তুলে ফুলের দিনগুলি
গোধূলি হার মানে ওড়ায় রঙধূলি
এই তো মরশুমী ফুলের ফাগ লাগে

নাকি এ রোশনাই গোলাপী বসবার
কী মায়াজাল ছায় কাজলসুর্মায়
সোনালীলালনীলে শহেলী দিলদার
নাই কি নিদ তার দুচোখে নিদ তার।

(দুই)

রঙের বিদ্যুৎ দৃষ্টি ঝাপসায়
চেনে না রঙ্গিলা চেনে না কবিরে
রূপসী সরসীর নর্সিশস হায়
মুকুরমোহমনে পায় কি গভীরে

কবিরে চেনে তবু তারই সে রূপকার
সুদূর ছায়াপথ সুচির ধ্রুবতারা
রূপের তিমিরেই অরূপজ্যোতি তার
নিভৃত ধ্রুবতার॥

বলো না কতদিন এমন ক'রে

প্রণব মিত্র

বলো না কতদিন এমন ক'রে
ঘুরবো পথে পথে হাওয়ার গান শুনে
বলো না কতদিন এমন ক'রে।

গ্রীষ্ম যায় ঝ'রে, হেমন্তও
বাতাসে আর কোনো গান তো নেই
হায় গো সুর নেই নীলপাখির
হায় নিরুত্তাপ দিনান্তও

কত না দিন এলো কত না বার
চিহ্ন মেলে দিলো ঝরাপাতার,
পুরোনো পথ সে তো হয় না শেষ
হোলো না প্রশ্নেরা বিনিঃশেষ—
তবুও তোমাকেই চেয়েছি শুধু আর
বলো না কতদিন এমন ক'রে
ঘুরবো পথে পথে হাওয়ার গান শুনে
বলো না কতদিন এমন ক'রে।

যদিও জীবনেতে দুরাশা নেই
হয়তো নেই কোনো দুঃসাহস,
ভেবেছি বোড়ে চেলে কিস্তিমাৎ

করতে পারলেও করে কী ফল;
তবু নিরুত্তাপ নয় জীবন—
কেননা তোমারি তো আগুন নিয়ে মেয়ে
জ্বলেছে রাতদিন জ্বল্‌ছে মন।

সূর্য যায় ঝরে হেমন্তের
হলদে শীত এসে পাতা ঝরায়,
একটু ওম-করা ঘরের কোণ
চাইতে চাইতেই কাটে জীবন—
ভাবছি অপলক তোমার কালোচোখ
তোমার তুলতুল রেশম চুল।
সূর্য ঝরে গেলে হেমন্তের
এখন্ আর কোনো গান তো নেই—
দেবে কি আশ্বাস একটি বিশ্বাস
একটি নিঃশ্বাস বসন্তের।

বলো না কতদিন এমন ক'রে
ঘুরবো পথে পথে হাওয়ার গান শুনে
বলো না কতদিন এমন ক'রে।

অন্বেষণ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

খুঁজে খুঁজে মরি।
আবদ্ধ প্রাণের দ্বারে করাঘাত হেনে
ডাকি নাম ধরে'
প্রাণপণে জোরে জোরে,
দেয় না দেয় না সাড়া নির্মম প্রহরী।
হাওয়ায় চীৎকার ক'রে ডাকি
ফাল্গুন মন্থিত দিনে
বসন্তের পদক্ষেপ পথে চিনে চিনে;
এমন কি কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠের আকাশে
যখন প্রাণান্ত ডাকে তৃষার্ত চাতক,
মরা গাঙে মাছ খোঁজে বক,
আমার অস্থির ডাকে সুনির্মম সূর্য শুধু হাসে।

দিন যায় রাত যায় আচ্ছন্ন হৃদয়
খোঁজে তাকে, খোঁজে কাকে! কাকে খুঁজে-খুঁজে
হন্যে হ'য়ে পথে ঘোরে? চোখ আসে বুজে
প্রতীক্ষায় তন্দ্রাতুর, পউষের সঙ্কীর্ণ নির্দয়
শীতের কঠিন ছায়া সারা মনে প্রাণে
সর্বনাশা জড়তার তীক্ষ্ণ ছায়া হানে
প্রত্যাশাকে চূর্ণ করে, দণ্ড দুই শীতের ছায়ারা
ঘুরে ঘুরে খেলা করে গাছে-গাছে তৃণদলে ঘাসে,
দু' দণ্ডের জন্যে জেগে স্নিগ্ধ হাসি হাসে

কৃষ্ণচূড়া, একেশিয়া গাছেদের শাখা,
বৈকালী বাতাস এসে সঙ্গোপনে রেখে যায় কোণে
শীতল আমেজ এক করুণার গন্ধ দিয়ে মাখা।

আর আমি খুঁজে মরি জীবিকার একটানা বিভ্রান্তির ফাঁকে
হৃদয়ের সুরটিকে ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ অবসরে
আলোর শিশুর মতো। দূরে তীব্র ভাঙা কণ্ঠে হাঁকে
জীবিকার জগন্নাথ, হিংস্র হাতে অমোঘ নিয়মে
ভাঙে আশা, ভাঙে প্রাণ, ভাঙে প্রেম মোহ,—
কুটিল হিংসায় দীর্ণ সহস্রের অখিল আগ্রহ।

আমি তবু বার হই। তবু ভোর হ'লে একবার
মাঠে যাই, দূরে যাই, একেশিয়া গাছটির দিকে
বারেক তাকাই। আর কৃষ্ণচূড়া স্তবকের থেকে
তুলে নিই দু'টি ফুল,—তারপর ঘরে ফিরে এসে
আবার জমাই পাড়ি রুদ্ধশ্বাসে জীবিকার দেশে॥

তাতারসমুদ্র ঘেরা

নরেশ গুহ

ছড়ানো প্রাণের মেলা, জীবনের মুগ্ধ আনাগোনা:
এ সংসারে আনন্দের শত্রুতা সাধতে পারবো না।
কে মন্দ মানুষ, কেবা শাদা কালো,
তাকাও মুখ তোলো চোখে আলো জ্বালো,
প্রাণরঙ্গভূমি এই, শেষ বার চেয়ে দেখ মন,
তাতারসমুদ্র ঘেরা জননী বসুধা, উন্মোচিত ধুলোর প্রাঙ্গণ।
বিদেশী মাল্লার নৌকো ঘাটে ঘাটে, দেশান্তরী জাহাজের ভিড়,
মরুভূমি পার হ'য়ে ক্যারাভান অন্যদিকে ফেলেছে শিবির।
দোকানে বিচিত্র পণ্য, রকমারী মালা, বালা, কাঠের চিরুণী
বাহার মাটির হাঁড়ি, সাজানো সঙীন মতো দেখতে আখ।
কিসের ডুগডুগি শুনি?

চলো মেলায়, চলো মেলায়, বেলা এলায় মাঠে বনে,
রাঙা ধুলো তুলি বুলোয় প্রাণে মনে।

খুঁজবো না অন্য অপার্থিব ঊর্ধ্বে নীলিমার শূন্যে,
যা আছে এখানেই, আবর্তিত এই নরনারীর উদগত অদৃশ্য অপার পুণ্যে।
পাণ্ডাকে অচল সিকি সঁপে খুঁজব কি স্বর্গের সিঁড়ি?
জুয়াড়ীর পাপচক্রে সর্বস্ব খুইয়ে কেন বাড়ি ফিরি।
উন্মনা শীতের রোদ, দূর থেকে বরং দেখি, ভাঙা দেউলের দরজায়।
গলাগলি পাড়ার মেয়ে দুটি ঘর যায়।
এর মধ্যে তুমি আমি সে
আরো অগণ্য অন্য, চিনিনে যাদের, পাইনে দিশে,
মন্দ, আধ-মন্দ, কী-জানি-কেমন, শাদা কালো বাদামী।

অশেষের লব্ধ বিস্ময়, বারবার মনে হয় হা—কোথায় আমি !
কেন এলাম ? কিসের টানে আসা ? কার কী রেস্ত ? কার খোঁজে
খাপছাড়া আড়াল লোকটি ঐ পথিক চোখ বোঁজে।
কোন প্রেমে ঐ বিকলাঙ্গ
ব্যস্ত ভিড় এড়িয়ে হঠাৎ তার যাত্রা করল সাঙ্গ।
জানি না, জানবো না। চলো, এক দান নাগরদোলায় দুলি।
অন্ধ ভিখিরীর ভরলো না হয়তো দিনান্তের স্বল্প আশার ঝুলি।
ডুম ডুম্ নাগারা পিটছে দুআনা টিকিটের সার্কাসতাঁবু ;
পানউলীর সঙ্গে নিভৃত ঠাট্টায় রত পামশু পরা বাবু।
দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখি, শুকোয় না পটুয়ার তুলি।
উদাসীর ধুনি জ্বলছে, পাশে সিঁদুর লেখা বিমর্ষ মড়ার খুলি।
এর মধ্যেই পকেট কাটছে কেউ, (মূলধন বাড়ায়),
সুখের অংশনে যাবে দ্রুত ট্রেনে, কম ভাড়ায়।

জানি এই শেষদেখা, দেখে তাই চোখ ফেরে না, এমন। আশ্চর্য
মর্ত্য জীবনের পারম্পর্য।
উত্তমের নিকোনো আঙিনা, অধমের নোংরা গন্ধ গলি,
খোলা চোখের সময় পাই যেন দেখতে সকলই।
মা-মরা শিশুর শুকনো মুখে সন্ধ্যায় কেনা শস্তা বাঁশী
শুনতে শুনতে শেষ যেন ঘাটে আসি।
কিংবা যাই পাহাড়ী পাকদণ্ডী বেয়ে দূরে
কুয়াশায় মিশতে, প্রাণরঙ্গভূমির মেলা ঘুরে।
অথবা নামি পাতালের সিঁড়ি বেয়ে তলায়
প্রত্যক্ষ করতে আঁধারের বিখ্যাত কারুকলায়।
তখনো চলবে—জানব—দেশ দেশান্তরী আনাগোনা।
সাধ নেই, সাধ্য নেই, এ মিলনআনন্দের শক্রতা সাধতে পারব না।

TWO POEMS

SADIST TIME

I have waited this chameleon day
beneath the willow that grows
beside the pool...I do not see its long silk
tassels mirrored within,
nor sky bowl filled with blue...
nor dragon fly wheeling across
glass surface.
All I see is your image.

How long one day is,
how slow sadist hands of Time move !
Do you hear each ampere beat ?
It is my heart pulsing hours
for your return.
The sun has fallen behind the hill sixty
beats ago...and fragrance of your nearing
numbs cadence of reason.

When the willow shades us you will see
my face bend to yours
in the pool's reflection.

FLEDGED

Excuse wantoning of my eyes
unveiled to life's light...
I have beheld thy bronzed thighs
and my heart fledged in flight.

Take my unfingered breasts, my lord,
they lean to your cupped hands...
I have unbraceletted my limbs
dancing a thousand sarabands!

JESSICA LEWIS

মার্কিন প্রবাসীর পত্র

অমিয় চক্রবর্তী

কবিতা-সম্পাদকেষু,

দূর প্রবাসে বাংলা কবিতার বই নিয়ে বসেছি। কাব্যের চুল-চেরা বিচারের পক্ষে এটা অনুকূল অবস্থা নয়। মন-কেমনি হাওয়া, যাকে এরা বলে নস্টাল্‌জিয়া, তর্কবুদ্ধিকে উড়িয়ে দেয়। তার উপর নরেশচন্দ্রের এই প্রথম কবিতার বই বিশেষভাবে চিত্র-প্রতীকী,—মনে হয় নীল জলের বহু ওপারে আনন্তিক বাংলার সেই হৃৎভূমি দেখা দিল যেখানে গাছে গলিতে, চেনা সংসারের অসংখ্য নিবিড়তায় আমরা চিরদিনের অধিবাসী।

'দুরন্ত দুপুর' খুলে চোখে পড়ল কলকাতা। কলের জল, পাশের বাড়ি, গ্যাসের আলো, আর 'দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত······শাড়ির' আঁচল যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, ঘরে ঘরে ওড়ানো নিশান। তারপর চায়ের পেয়ালা, নতুন বই, আভা-বদলানো বাংলার আকাশ, নাগরিক দৈনন্দিন। তাছাড়া মাছি, পিঁপড়ে, পাড়ার বস্তির ঈষৎ উল্লেখ আছে। যদিও এই বাস্তবিক প্রসঙ্গে ভিড়ে-ভারাক্রান্ত কলকাতার জায়গা হয়নি; সদাগরি আপিস মিল অনাহার অত্যাচার সংগ্রাম সংঘাতের দূরধ্বনিও শোনা যায় না। নতুন যুগের উদ্যত প্রতিহত জনশক্তির কাব্য এ নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের যৌবনী ঢেউ বৃহৎ ইতিহাসের পটে আলোড়িত হ'য়ে এই সংকলনের কবিতায় পৌঁছয় নি। বহুলোকের কলকাতা শহরে এসে ঠেকেছে অলৌকিকের একফালি আলো: তারি সঙ্গে ঘরোয়া বাছাই-করা ঘটনার সংমিশ্রণে এই গীতিকাব্য। 'পাথরে-বাঁধা শহরে ফুটপাতে' কৃষ্ণচূড়ার অজস্র লাল ভ'রে উঠল এও যেমন আকস্মিক, তেমনি ডাকবাক্সে নতুন চিঠি, সিঁড়িতে চটির শব্দ, ঢক ঢক কুঁজোর জল খাওয়া ইত্যাদি

কলকাতার বাঙালি জীবনের নিত্য আনুষঙ্গিক হয়েও আশ্চর্য। 'শঙ্খ শাদা' কঠিন দেয়ালের গায়ে বসানো যামিনী রায়ের ছবি শিল্পের ঠিক একই পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু দুরন্ত দুপুরের 'হৃদয়ের উষ্ণতায়' ঘাসের রং, ছিন্ন সুখ, হঠাৎ মেঘের সঞ্চরণ, 'কান্নার করাতে যত ধার' তারি সঙ্গে একত্র মিশেছে। চিরদিনের বাংলা। সব সুদ্ধ গলিতে বাজানো একটি বাঁশির সুর। কখনো শহরের কথা, কখনো গ্রামের ছবি ঐ বিষণ্ন মধুর কড়ি-মধ্যমে থরথর করছে। হৃদয়মনের কাল্পনিক ছায়াচ্ছন্ন, কখনো রোদ্দুরের ঝলক-দেয়া। দুরন্তের বেদনায় বাঁধা কাছের ঘটনা। বইখানির নাম 'দুরন্ত দুপুর' না হ'য়ে 'দুরান্ত দুপুর' হলে আরো মানাতো। দুরন্ত অভিমানী মননের দিন অন্যত্র।

নরেশচন্দ্রের কবিতার ব্যাপক রাজ্য প্রাকৃতিক; রাঙা পাতায়, এক বর্ষার বৃষ্টিতে, মৌমাছির প্রসঙ্গে বিকীর্ণ। নাম থেকেই ভাব অনুমিত হয়। শান্তিনিকেতনে ছুটি, মাঘ শেষ হয়ে আসে, আঁকা বাঁকা বালি—ছোটো বড়ো প্রাকৃত কবিতা,—বিশেষ অর্থে। যুগল মেয়ে, দুই নদী, ভীরু মেয়ে, লগ্ন, শকুন্তলা, তুমি কি রেখেছ কথা ইত্যাদি অন্য শ্রেণীর; প্রাকৃতিকের চেয়ে মানবিক হৃদয়ান্বিত। তৃতীয় পর্যায়ের কাব্য আরো স্বাধীন কল্পনাচারী, নাম থেকে গন্তব্য ধরা দেবে না। যেমন—বানানো ভালো, ময়ূরভঞ্জ, ট্রেন, অজাতশত্রু গান, আমার বন্ধুকে; একই প্রসঙ্গে নানা প্রসঙ্গ মিশেছে। আরো নাম যোগ করতে চাই ছোটোদের কাব্য থেকে : হাওয়ার হাঁস, রুমির ইচ্ছা, লাখো বছরের পুরোনো জমিতে। বিষয়ের দাবি অতি প্রধান না হওয়ায় লীরিকের মেজাজ এতে খুলেছে।

'বানানো ভালো' সুন্দর ছোটো কবিতা। ছবির অনেকখানি অন্তর্দৃষ্টি-গোচর।

১. ···চড়ার বালি
উত্তরে পুবে বাজে ঝঞ্ঝার খর করতালি

২. কত বর্ষার ধারে কেটে গেছে পুরোনো সে তীর

৩. চোখে স'য়ে যাওয়া বিবর্ণ রাত এ নয়, এ নয়

৪. সরাইখানার খোলা জানালার পাণ্ডু আলোয়
পেয়েছি আবার মন ভোলাবার বানানো-ভালোয়।

নানাবর্ণের সূক্ষ্ম সংসর্গিত কবিতা।

'ময়ূরভঞ্জ' কবিতায় অনতিপ্রকট দুঃখ ও স্মৃতির অনুরণন; বর্ণনার চেয়ে বেশী।

১. বুনো বাংলোয় রাতে ঘুম নেই, উতলা মন

২. ···সেই শালবন
কতো হাসাহাসি করল সেবার সুযোগ বুঝে।

৩. শত কবিতার ঘুমভাঙা ভোরে এনেছিল কচি আম

যদিও এই কবিতার শেষ লাইনে 'পর্যটক' কথাটায় খটকা লাগে; 'তলে'-র সঙ্গে 'ভুলে'-র মিলেও স্বস্তি নেই। গিলের প্রসঙ্গ পরে তুলব।

আখ্যায়িকা জড়ানো কবিতা 'ট্রেন', 'আমার বন্ধুকে'—স্বতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। সুন্দর সমগ্র পদ এই দুই কবিতা থেকে পৃথক চয়ন ক'রে নেওয়া যায়, কিন্তু সব মিলে দীর্ঘ কবিতায় কবি এখনো সংহতির চেষ্টা করেন নি। ভাবের সূত্র সন্ধান করলে নিরাশ হতে হয় না, কিন্তু বিস্তৃতি ক্লান্তিকর। অথচ কবির পরিণত হাত এবং দৃঢ়তার সাক্ষ্য এই তৃতীয় পর্যায়ের মনন-প্রধান কবিতায় নানাস্থানে দেখা দিয়েছে। নমুনা :

১. আমার সময় আজ। পৃথিবী আমারই
(আমার বন্ধুকে)

২. এই দৈব-দুর্দিনের সর্বস্ব আমার (,,)

৩. চিন্তার লাঙল আজো কপাল চেরেনি (,,)

৪. সাত পুকুরের ভিটেমাটি ফেলে পার হয়ে যাবে চাষী
সন্ধ্যার খেয়া :

(অজাতশত্রু গান)

'ট্রেন'-এর এই পদগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে রাখবার—

১. দুরাশার সিঁড়ি তোলা অজানা ষ্টেশন

২. প্রকাণ্ড সূর্যের নিচে শ্রমে তিক্ত, জ্বরে মূর্ছাতুর
আকাশ পৃথিবী ভরা প'ড়ে আছে নির্বাক দুপুর।
আদিগন্ত রেলপথ—অনিশ্চিত অনন্ত সময়—
জীবনের লৌহচক্র অক্লান্ত ইচ্ছায় পার হয়।

['লোহার চাকা' অন্য কথার যোগে ব্যবহার করা যেত কিনা]

মুহূর্তের বনপথ, মুহূর্তের মাঠ,
জ্যোৎস্নায় কুঞ্চিতরেখা হ্রদের ললাট,
গোধূলিতে হাটফেরা মানুষের ভিড়
পার হ'য়ে মধ্যরাতে উদ্দাম নদীর
নির্জন পাড়ির পরে চিরতরে থেমে যাবে ট্রেন

[নির্জন পাড়িতে এসে থেমে যাবে ট্রেন (?)]

প্রশ্ন শুধাবে না কেউ—'কোথায় যাবেন?'

[প্রশ্ন কেউ করবে না (?)]

প্রতিচ্ছবি না হ'য়ে কাব্যের প্রকৃতি এখানে ভেঙে বদ্‌লিয়ে রাঙিয়ে স্বাধীন রূপান্তরিত। স্বপ্রকাশের এই পথ।

২

হাওয়াই ডাকে অত্যন্ত মাশুল নেবে, তবু এই চিঠিতে সমালোচনার দুটো প্রসঙ্গ যোগ করব। ঘর-মননী প্রবাসী হয়েও যথারীতি বাংলা তর্কে নামবার লোভ জাগল। বেশী সময় নেবো না।

প্রথমত ছন্দ, মিল, প্রসাধন। মিলের দিক থেকে বলি—নদী, গতি; বাজাই, বাঁচাই; ভরে, গড়ে; গায়ে, চায়; বড়ো, করো; জান্‌ত, অফুরন্ত; ইচ্ছা, তুচ্ছ; আজই, বাঁচি; বনতলে, ভুলে; পঙ্কিলতায়, পাতায়; সেও, ঢেউ—ইত্যাদিতে মন সাড়া দেয় না। মিলের আকস্মিতা, বা মিলের হঠাৎ আশা-ভঙ্গ কোনোটারই চমক কবি জাগান নি। অর্ধমিল, এমন কি দূর প্রতিধ্বনিত, অর্ধস্ফুট এবং আপাত-যদৃচ্ছ অথচ জটিল শিল্পিত মিলের ব্যবহার কবিতায় চলবে, যদি তা বিশেষ নির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত আঙ্গিকে দেখা দেয়। আধুনিক পশ্চিমী কাব্য অনেক দিন থেকেই পূর্ণাঙ্গী বা সম্পূর্ণ মিলের দাসত্ব কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু যথার্থ কাব্যে প্রত্যেকটি কবিতা স্বকীয় নিয়মানুযায়ী অন্তর্গূঢ় মিলে ও অমিলে বাঁধা; ওয়েন থেকে অডেন পর্যন্ত এই সচেতন কারিগরির ব্যতিক্রম হয় নি। ইয়েট্‌স্‌ বা এলিয়টের তো কথাই নেই। এলিয়ট অনেকটা পাশ কাটিয়ে গেছেন কিন্তু ইয়েট্‌স্‌-এর অর্ধমিল কৌশলী নিয়মে বাঁধা।

ছন্দের বৈচিত্র্য 'দুরন্ত দুপুর'-এ তেমন জায়গা পায়নি। কবির কান সূক্ষ্ম সজাগ কিন্তু নূতন ছন্দ ও মাত্রার পরীক্ষায় তাঁর কাছে আরো সাহসিকতার দাবি করি। আধুনিক কাব্যে গদ্যপন্থী ছন্দ প্রবর্তিত হওয়ায় যথারীতি ছন্দের নূতনতর উৎকর্ষচর্চা প্রতিহত হয়েছে; এমন কি, গদ্যছন্দের অনুকরণে গীতিকবিতায় নানা ব্যাধি দেখা দিয়েছে; বাক্যের অন্যায্য ভিড় তার মধ্যে অন্যতম। পুরোপুরি গদ্যছন্দের স্বাধীনতা বেশি, যদিও শিল্পের নিয়ম এড়িয়ে কারো মুক্তি নেই। খাঁটি কবিতায় স্বাধীনতা অর্জনের উপায় কঠিন। পয়ার অনেক অত্যাচার সহ্য করে কিন্তু কেবলমাত্র ভার চাপিয়ে তাকে নূতন ক'রে তোলা যায় না। পদ্য ও গদ্যছন্দের মিশ্রণ সম্ভব, কিন্তু এই পথ কণ্টকাকীর্ণ। লীরিক কবিতায় বাঁধা-ছন্দের বিচিত্র নূতনতর নৃত্যযোগ চলতে থাকুক।

কাব্যের প্রসাধনে বাক্যসাধনার দুরূহ চরম দাবি কবিকে মেনে নিতে হবে। কথাকে অত্যন্ত গভীরে বাজিয়ে নিলে তবে তার ধ্বনি স্পষ্ট হয়। শুধু কানে শোনা ধ্বনি নয়, বাক্যের অগণ্য সূক্ষ্ম শ্রুতি—তার overtone—

মনে ধারণ করা চাই। এর জন্যে চাই শিল্পের জ্ঞান এবং ধ্যান—যাকে বলা যায় শিল্পাগ্রহ—সংসর্গের নিবিড় আসঙ্গে ভরা বাক্যের শব্দ শুনতে হবে। তালের মেট্রনমে তা ধরা পড়ে না, অনিবিড় ঝঙ্কারে তা চাপা পড়ে, ললিত লঘু বাক্যে তাকে হারাই। আধুনিক বাংলা কবিতায় যেন অনুপ্রেরণা এবং অভ্যাস দুয়ের গূঢ়ত্ব আমরা না ভুলি, কথার আওয়াজ হারিয়ে কেবলমাত্র কথার শব্দ গেঁথে কবিতা লেখায় নিবৃত্ত হই। এই ক্ষেত্রে রচনার চপল ইচ্ছা চাতুর্য আমাদের শত্রু; রচনায় বিরতির ধর্ম আমরা ভুলতে বসেছি। দ্রুত চলতিকালের যোগ্য তরল বাক্যের আদান-প্রদানে কাব্য তৈরি হয় না। মগজে বিরল বাক্যের ঘনস্তর জমা হ'য়ে ওঠবার সময় থাকা চাই, যেখানে অবচেতনার জমিতে কথা নূতন হ'য়ে দেখা দেয়। বাক্যের সংস্কার ও নবীন সংসর্গ, সেই তন্ময়তা যা বাঙ্‌ময় অথচ অধিক, আমরা তারই শিল্পী। এখানে বলতে চেয়েছিলাম বিরল এবং সুসংযোজিত বাক্যের ওজন মেনে চলার কথা। সেই মাত্রা কী ভাবে রাখা যায়? গভীর তন্মাত্রবোধ এবং শিল্পের তীক্ষ্ণ বিচারশক্তিকে একত্র হৃদয়ে ধারণ করবার সমগ্রতা কাব্যজগতে দুর্লভ। অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পের ঐ পথ, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ভাষার বিচারে আরো বহির্মুখী প্রসঙ্গ তুলব। আমার বক্তব্য এখানে ইঙ্গিতে জানাব,—দৃষ্টান্ত 'দুরন্ত দুপুর' থেকে তোলা।

হাওয়া দোলা দেবে তারে (তাকে?); কাহার খোঁপার গন্ধ (কার সে খোঁপার গন্ধ, বা অন্য কিছু—কাহার নয়); চোখ থুয়ে আকাশের নীলে (চোখ রেখে?)।

“সাধু” ভাষা যখন আধুনিক বাংলায় যথার্থই অসাধু এবং অচল, তখন দুয়ের মিশ্রণে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। যেমন অতি মিষ্টত্বে দুষ্ট “কবিত্বপূর্ণ” বাক্যের ব্যবহার বাদ দিতে হয়, তেমনি নষ্ট-স্বাদ সুলভ সাহিত্যের অভ্যস্ত ভাষাকে শিকেয় তুলে রাখা ভালো। হয়তো পরে কাজে লাগবে। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগের অগ্রণী সেই যুগের গতি আরো দূর পর্যন্ত মেনে নিয়ে আমরা যথাসম্ভব ডুবাও, শুকাও ইত্যাদিকে বর্জন ক'রে ডুবোও, শুকোও ব্যবহার করব। আমারে, তোমারে, নাই, মম, তব,—অবস্থাবিশেষে

অনিবার্য হলেও বর্জনীয় মনে করাই ভালো। যা মুখে বলি না তা কলমে লিখব না এরকম প্রতিজ্ঞার বিশেষ মূল্য আছে। কবিতায় জায়গার অভাবে নানা অভিসন্ধির শরণাপন্ন হতে হয় কিন্তু সংহতির দাবি অসতর্ক বাক্যের ব্যবহারে রক্ষা হয় না, শেষ পর্যন্ত বাধা পায়। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো কড়া নিয়ম নেই কিন্তু কান ও মনের দুই খাড়া পাহারা যেন সজাগ রাখি। ভাষার ব্যবহারে সূক্ষ্ম চেতনার অভাব শিল্পচেতনারই অভাব।

খেলাচ্ছলেও 'কচি মুখে শাদা দাঁতে রোদের চিৎকার' চলবে কি না সন্দেহ। যদি ঐ পদ রাখতেই হয় তাহলে সমস্ত কবিতার ভঙ্গীও বদলানো দরকার। 'নগরে শিবিরে গ্রামে ধূ ধূ জ্বলে যায় সিগারেট, নারীর শরীর' অচল, কেননা সিগারেটের দগ্ধদশা এবং নারীদেহে অগ্নিকাণ্ড ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজি-কমেডির একই কোঠায় ঐভাবে ফেলা যায় না। ভুলে-যাওয়া দগ্ধ নগরীর ভয়ঙ্করতা এবং প্রকৃতির ঔদাসীন্য অথবা মনের তীব্র অযৌক্তিকতা কবি অন্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, তার জন্যে শিল্পের গাঢ়তা প্রয়োজন, ভাষার ইপ্সিত লঘুছন্দ সত্ত্বেও।

'আজই আজই আজই'—ত্রিত্ব ব্যবহারে বলার জোর কমেছে। একই স্থানে 'স্তব্ধ নিষেধ তনুমনময়   উত্তাল তব তনুমনময়' বেশি বলেই অকিঞ্চিৎ। অত্যুক্তির দেশ এই মার্কিনে সাহিত্য-চর্চার ক্লাশে প্রায়ই নিবেদন ক'রে থাকি: শিল্পের ক্ষেত্রে ১+১=২ না হয়ে −৩ হতে পারে। হোক উপমা, হোক বাক্যের ব্যবহার, অনুপ্রাস—অধিক বাড়ালেই অভাব বাড়ে।

বিস্ময়চিহ্ন, প্রশ্নচিহ্ন কবিতায় বিকল্পে ব্যবহার্য। 'একই বাসনার জ্বালা!' 'তবু আঁখিতারা ভয়তন্ময়!' 'তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই থাকে?' চিহ্নহীন হলে আরো একান্ত হত, ভাষার একটু অদল বদল প্রয়োজন। ভাষার বিশেষ ব্যবহার ও ভঙ্গী অনিবার্য প্রশ্ন বা বিস্ময় জাগাবে এই কথা—চিহ্নের সাহায্য খঞ্জের যষ্টি। কবিতার লাইন স্বনির্ভর হলে ভালো, অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটবে কিন্তু তাও মূলশিল্পের খাতিরে, বাহিরের কোনো মূল্য বিচারে নয়।

ভাষার প্রসঙ্গে বলতে হয় বাংলা কবিতার প্রধান বিপদ তার গানের

সুরত্ব—অর্থাৎ গানের কথা হিসাবে ব্যবহৃত কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্যের সজ্জ বাক্যশিল্পের বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। গীতিকাব্যে গানের আমেজ লীরিকে লায়র-এর ধ্বনির মতো; অশ্রুত, অদৃশ্য ধ্বনিক পরিমণ্ডল। অসম্পূর্ণ রচনাকে পূর্ণতা দেবার উপায় এটা নয়। বৈষ্ণব কবিতা গীতিমুখর হয়েও এই দুর্বলতা হতে মুক্ত, এমন কি যথার্থ যা ধ্যানের গান, যেমন মীরার ভজন, কবিতা হিসাবেও সুদৃঢ়। বাংলা কবিতায় শাক্ত ও বৈষ্ণব গান, নিধুবাবুর টপ্পা, বাউল কীর্তন রামপ্রসাদী মাঝপথে চলেছে,—কখনো বা গানের বেশি ধার ঘেঁষে চলতে সুরের অতলে হারিয়েছে। অন্য বিচারে যেমন তার অন্য অপরিমেয় মূল্য, কবিতার তৌলে ঐ সুরে-হারানো গানের কথা যথেষ্ট ভারের চেয়ে অনেক লঘু—সেখানে লোকসানের অঙ্ক। রবীন্দ্রনাথের গানও নানাপথচারী; তাঁর অনেক রচনা কথায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। তিনি নিজে বলতেন ঐ জাতীয় গানের কথা কথার প্রদীপ তৈরি, সুর না যোগ হলে আলো জ্বলবে না। যদিও তাঁর অনেক গানই কথার সম্পূর্ণ শিল্পে সৌকর্যে কাব্যের কোঠায় পৌঁচেছে। তাঁর পুরোপুরি কবিতা—এমন কি লঘুছন্দের লীরিক—বাক্য এবং ছন্দ প্রসাধনে বলিষ্ঠ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাংলা গীতিকাব্যের রাজ্যে সুরের অপেক্ষায় অনিশ্চিত ও সন্তঃপাতী কবিতা রচনার দৌর্বল্য সহজে ঘুচবে না। এই বিপদকে সম্পদ ক'রে তোলবার প্রতিভা চাই।

অপরপক্ষে অত্যন্ত গদ্যভাব এবং ভারি কথার সিমেণ্ট-করা পদ আধুনিক কাব্যের আরেক সমস্যা। অতিসৌখিনতার মোহ ত্যাগ করতে গিয়ে এবং সংহতি ও চিন্তা-ঘনতার মননশক্তি ফোটাবার ন্যায্য প্রেরণায় আধুনিক পূর্বী ও পশ্চিমী কবি অনেক সময় আলো হাওয়া খেলবার জায়গা রাখেন নি। দরজা জানালা বন্ধ ভারি কথার আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়, ভাবের কাঠিন্যে মাথা ধরে। এও দুর্বলতা, শক্তির পরিচয় নয়। মনে রাখতে হবে বাংলা কবিতায় এই মাথা-ভারি মস্ত কথার দৌরাত্ম্য সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্যবহার হয়ে দেখা দিলেও এই মানসিক প্রতিক্রিয়া নকল সংস্কৃত এবং নকল পশ্চিমী। স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন প্রেরণা এনেছিলেন পশ্চিম থেকে, বহু ক্ষেত্রে তিনিও

পর্বত-প্রমাণ সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার ক'রে আধুনিক মনের দাবি মেটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সফলতা আশ্চর্য, সেখানে তিনি বাঙালি শিল্পী, বা, শিল্পী, কিন্তু তাঁর স্খলনও আমাদের সাবধান জানিয়ে গেছে। খাঁটি সংস্কৃত কাব্যে এই কৃত্রিম বাক্যবিড়ম্বনা নেই তা বলা বাহুল্য। বাংলা কবিতায় যে-শিল্পী গানের নির্ভরতা এবং স্থূল বাক্যের ঘনত্ব এই দুই খাঁড়ি এড়িয়ে চলবেন তিনি জিতবেন।

মাননিকতার প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যেরও সতর্ক হবার সময় এসেছে। চেষ্টিত সংস্কৃত বা পশ্চিমী ভঙ্গীর ব্যবহার নূতন বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল; সমালোচনায়, রসরচনায়, এমন কি অন্য ভাষার গদ্য বা পদ্যের বাংলা তর্জমায়। যাঁরা আজো লুপ্ত ভৌতিক বাংলার ধারা বেয়ে সাধু ভাষায় লেখেন তাঁদের কথা তুলব না; তাঁরা অতীতের মর্যাদা নষ্ট করেন, বর্তমানেরও। নূতন প্রতিভাশীল বাংলা লেখক যদি যথার্থ প্রাচীন সংস্কৃত বা আধুনিক পশ্চিমী গদ্যজগতে শিল্পের নিভৃত প্রয়োজনে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি মুক্তি পাবেন, তাঁর ভাষা সহজ আত্মীয়তায় সাবলীল হয়ে দেখা দেবে। সংস্কৃত কথা বাংলার বিশেষ সম্পদ, সেই অক্ষয় খনি থেকে নতুন ক'রে বাক্য সংগ্রহ, সংযুক্ত বাক্যের উদ্ভাবন চলতে থাকবে। কিন্তু যেমন গুণী পশ্চিমী লেখকের হাতে ক্ল্যাসিকল ভাষার সঙ্গে অজস্র প্রাণবান বহুদেশীয় ভাষা নিত্য নূতন ঐশ্বর্যধারায় একত্র মিলে মূল ভাষাকে আশ্চর্য পুষ্ট ক'রেছে, তেমনি বাংলা ভাষায় আরবি, ফার্সি, এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক জগতের নিত্যপ্রয়োজনীয় পশ্চিমী বাক্যের অধিকতর ব্যবহারে বাংলার সৌকর্য বাড়বে। কিন্তু সচল স্রোত থেকে এই ভাষা তুলতে হবে। তা না হলে আবার সেই ক্লিষ্টতা দেখা দেবে যার বিরুদ্ধে এই আয়োজন। বাংলা গদ্যে বা পদ্যে অত্যন্ত চক্রিত, ঘূর্ণিত, দীর্ঘায়িত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক শব্দের ঝড় এবং ভারি ইংরেজী বাক্য অতি আধুনিকদের মধ্যেও ভয়ঙ্কর ব্যাধির মতো প্রবেশ করেছে, সমুদ্রপার থেকেও সেই সব রচনা পড়লে মাথা ঘোরে। যা সহজে বলা যায় তা দুরূহ করলে বা অযথা বিদেশী ভাষা ব্যবহার করলে গভীরতা বা মানস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা বাড়ে না। নানা জ্ঞানের চেতনার উল্লেখ ও প্রয়োগের

উজ্জ্বল হৃদয়বান ভঙ্গী আছে, উৎকর্ষবান লেখক তার সন্ধান জানেন। যাঁরা পুরানো চালে বক্তব্যের অভাবকে সাধুভাষার ঘনঘটায় ঢাকা দেন—সাধারণত সেই সব রচনার সাব্-এডিটিং করলে সমস্ত প্রবন্ধকে দুই বা তিন পাঠ্য-প্যারাগ্রাফে পরিণত করা যায়—সেই সব জাত-মানা পৌত্তলিকদলের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা নূতন ক'রে নকল ক্ল্যাসিকল্ বা পণ্ডিতী মর্যাদা অর্জন করতে চান তাঁদের স্বরচিত গলার ফাঁসে তাঁদের রচনা কণ্ঠাগত। পদ্যেও এই দুরারোগ্য বিড়ম্বনা 'সাধু' ও 'অসাধু' দুই ভাষার রচনায় বিদ্যমান,—চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত ক্রেঙ্কার ঝঙ্কার সহযোগে বা ভারি কথার স্তূপে কেউ পাঠককে এবং আপনাকে চাপা দিতে চান। এই সব রচনা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশবার পূর্বেই কর্ণপটাহ ছেঁড়বার সম্ভাবনা। অথচ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ রাজপথ খুলে দিয়ে গেছেন, সেই পথে বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রাচীন ও নবতন শিল্পসম্ভার খাঁটি বাংলা ভাষায় চলাচল করেছে। গদ্যবাংলার মনীষী প্রমথ চৌধুরী 'ছিন্নপত্রে'র প্রবর্তিত উজ্জ্বল ধারায় বিচিত্র ঐশ্বর্য রেখে গেছেন; জ্ঞানের, শিল্পের, প্রসাদগুণের কোনো অভাব ঘটেনি। বাংলার খবরের কাগজে এখনো ভুতের কীর্তন, ভাষার কৃত্রিমতার দিক থেকে;—এর চেয়ে ক্লিষ্ট, নকল সাধু, গঙ্গার জল-মেশানো ইংরেজি মার্কিনি কাগজি ভাষার একত্র প্রমাদ কল্পনা করাও শক্ত। যাকে বলে, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—কাগ্জি ভাষায়—তা অবশ্য আছে। কিন্তু বেশি নয়। এই নকল বাংলার লেখকদের কিছু কলম বা বাংলা টাইপরাইটর স্বতন্ত্র ম্যুজিয়মে রাখা থাকুক-- ভবিষ্যৎ ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাবে।

যাঁরা আধুনিক, যাঁরা সূক্ষ্ম সংস্কৃতিবান, যাঁরা সচেতন শিল্পী তাঁরা যেন ভাষার জন্যে কেবলমাত্র সংস্কৃত অভিধান না উল্‌টিয়ে বা পশ্চিমী রচনাকে সম্পূর্ণ ভুল ভঙ্গীতে তর্জমা না ক'রে পাড়ার চারদিকে কান ও মন নিয়ে ঘুরে বেড়ান। প্রতিবেশী মুদী, ছুতোর, কামার, মাঝি, রংরেজিনি, কুমোর, মিস্ত্রী মজুরের কাছে তাঁরা ঝুড়ি ঝুড়ি মহার্ঘ কথা পাবেন। গ্রাম্য কলাশিল্পী, ঘরের মেয়ে, অভিজ্ঞ বুড়োমানুষের কথায় তেজ আছে, কল্যাণ আছে, প্রাণ আছে—তারা ছাপাখানার ভূতে-পাওয়া নয়, খাঁটি বাংলার মানুষ। দেখা

যাবে তার মধ্যে শত শত জাত-হীন কথা আরবি, ফার্সি, এমন কি পশ্চিমী সরস হয়ে মিশেছে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের পাঠশালায়, টোলে নানা স্তরের সংস্কৃত বা অর্ধ-সংস্কৃত ভাষা তুলে নিতে হবে, যা বদলিয়ে বা নূতন সহযোগে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া ইংরেজ মার্কিন দূত সর্বত্রই আছে, স্বাধীন ভারতে তাদের প্রতিপত্তি কমেনি, বেড়েছে বলেই শুনতে পাই—ইংরেজি বই এবং এদের ভাষার সংসর্গ যাবার নয়। কিন্তু বীরবলের মন কই, তাঁর হাল-খাতার বদলে দুর্বল পাণ্ডিত্যের লেজার-বই আজ বাঙালী সাহিত্যে ছড়ানো। বাংলার স্বাধীন মননশক্তি, আত্মপ্রকাশের খাঁটি বাংলা ভাষা এখনো পুরোপুরি দেখা দিচ্ছে না। মাটিতে শিকড় গভীর না হলে বিশ্ব-জগতের আলো হাওয়া কাজে লাগবে না,—বাংলা সাহিত্য আপন সরস ভাষার সন্ধান পেলে নানান আকাশে তার পত্রপল্লব বিশ্বজনীনতায় প্রকাশ পাবে।

কথার দৃষ্টান্ত দিই। শক্তি, শক্তিমান শুধু নয়, জোর জোয়ান দুই চলবে; চলতি কথায়, এবং গম্ভীর জ্ঞানের ভাষায়। বাংলায় থিসিস্ লিখতেও যেন আধুনিক বাঙালী পুস্তক, বই দুইই ব্যবহার করেন; মসী-র বদলে কালি তাঁর লেখায় বেশি কাজে লাগবে। অন্তঃপুর, অন্দর; সাফ, পরিষ্কার; প্রাচীর, দেয়াল; সভা, মজলিশ কোনোটাই কাব্য বা ইতিহাস দর্শনের গম্ভীরতম আলোচনায় ত্যাজ্য নয়। সবটাই নির্ভর করে লেখকের যথার্থ মাত্রাজ্ঞানের উপর, নূতন বা পুরোনো অভ্যাসের অনুবর্তিতায় নয়। বৈজ্ঞানিক কথা, ব্যবহারিক পারিবেশিক জীবনজীবিকা সংক্রান্ত কথা, দেশের নাম, নূতন উদ্ভাবিত জিনিসের বা বিদ্যার নাম পশ্চিম বা পূর্ব থেকে নির্ভয়ে নেয়া যায়, কবিতায় গদ্যে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় যদি খাঁটি বাংলা মন এবং ভাষা আমরা না হারিয়ে বসি। রাষ্ট্রিক প্রসঙ্গে জাপানি ডায়েট্, ইংরেজি পার্লামেন্ট, ইরাণি বা তুর্কী মজলিশ, এমন কি 'আরব-এশিয়ান ব্লক' বাংলায় চলবে। রাশিয়ান ম্যুজিক, ইস্পানি বাস্ক বা ক্যাটালনিয়ন নির্ভয়ে বাংলা সাহিত্যে আগন্তুক। শুধু পুরোনো স্টেশন মোটর ইত্যাদি নয়, নূতন রেডিও (বেতারও), এরোপ্লেন (ও হাওয়াই জাহাজ), অ্যাটম বম্ব্ (এবং আণবিক

বোমা), বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য। রেডার, টেলিভিশনের তর্জমা হয় তো ভালো, না হ'লেও ক্ষতি নেই। হিন্দী তর্জমাবাক্য হয়তো আরো বেশি কৃত্রিম হবে,—এ বিষয়ে বাঙালী সাহিত্যিকের বিচার মান্য, কোনো রাষ্ট্রিক প্রতিনিধি বা আপিসের হুকুম খাটবে না। বাঙালী কবি বলবেন কী ভাবে নিয়ন লাইট (বা নিয়ন আলো), নাইলন্ বা ডেক্রন্ তিনি কাব্যে ঢোকাবেন। রেশমের সঙ্গে সিল্কও লিখতে দোষ নেই। কেননা পাড়ায় পাড়ায় সিল্কের শাড়ি ছড়িয়েছে। হয়তো ইস্পাতের সঙ্গে ষ্টীলও চলবে, অ্যালুমিনম্ তো বটেই। হার্মোনিয়ম নামক বেসুরো অসুর যন্ত্র বাজিয়ে প্রাচীন ভারতীয় গান বধ করতে অনেক তথাকথিত উৎকৃষ্ট গায়কদের কিছুমাত্র বাধে না—তাঁদের তুরীয় অনুনাসিক কীর্তি দলীয় আহা ওহো সহযোগে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, অথচ হার্মনি বলতে দ্বিধা কেন। অর্কেষ্ট্রা চলবে, ঐকতানও; হয়তো অর্কিডের সংস্কৃত নাম চলা উচিত হলেও চলবে না। পুরোনো কথার নতুন ব্যবহার প্রশস্ত, কোনো ক্ষেত্রে একেবারে তাজা বিদেশী বা স্বদেশী কথা সোজাসুজি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করবে।

সতর্কতা ও সাহসের নিয়ত উদ্যম বাংলার নবীন সাহিত্যে কামনা করি। আমাদের কারো পক্ষেই হয়তো বলা সম্ভব নয় নূতন কোন কবির লেখায় যথার্থ সাম্প্রতিকতা সৃষ্টিশীল হয়ে দেখা দিয়েছে, কে সেই রবীন্দ্রযুগবাসী—অর্থাৎ বাঙালি লেখক—যার রচনায় ছন্দ ভাষা উপমার পরিধি বিস্তৃততর, যার শিল্প সার্থক প্রতিভায় প্রয়োগের উদ্ভাবনায় উত্তীর্ণ। 'দুরন্ত দুপুরে'র লেখক সেই নূতন উদ্দীপিত পথে এগিয়ে যাবেন তাঁর কবিতা পড়ে সেই আশা মনে জাগল।

স্বর্গ

বুদ্ধদেব বসু

১

সোনালি ছায়াপথ পেরিয়ে এসে
সোনার তারা দুটি থামলো,
রুপোলি রাত্রির খোঁপার কাঁটাগুলি
হিরের ফোঁটা হ'য়ে নামলো
হলদে সিল্কের শয্যায়।

সে-নীল প্রান্তরে শব্দ নেই,
ভাষার ব্যবধান লুপ্ত,
কেবল মন্ত্রের প্রবল বীজে
প্রাণের জাগরণ জ্বলছে,
দীপ্ত কয়লার ফুলকি।

সে-দূর প্রান্তরে নিশ্বাসের
ছন্দে ফুটে ওঠে মুখ,
জ্যোতির বেদনার নিথর নির্বাণে
ঝিলিক দেয় দিকপ্রান্তে
অগ্নিবলয়ের উল্কা।

তবু তো মনে পড়ে যখন ছিলো
সময় ছিলো অফুরন্ত;
তখন জানতে কি, দগ্ধ দম্পতী,
অসীম মৃত্যুরে পেরিয়ে

আসবে স্বপ্নের সোনালি শয্যায়
যেখানে সময়ের চীৎকার
বন্দী জন্তুর কান্না যেন
ব্যর্থ প'ড়ে আছে বাইরে।

২

খুঁজিয়া পেয়েছি মন্দির
সন্ধ্যার মতো নির্জন,
রাত্রির মতো অপরূপ।

যেমন নদীর দুই তীর
অমাবস্যায় মিশে যায়,
অথচ হাওয়ার নিঃস্বন

অথচ স্রোতের কলতান
সেই আকাশেরে খুঁজে পায়,
যেখানে রক্তমাংসের

ইন্ধনে জ্বলে চিন্ময়
সপ্তর্ষির সামগান,
জ্বলে জন্মের বেদনায়

অন্তঃসত্তা বিশ্বের
লক্ষ তারার অশ্রুর
অবিচ্ছিন্ন আহ্বান:

তেমনি আমার মন্দির,
দেখা যায় কি না যায় তার
ছায়াচ্ছন্ন, গম্ভীর

অপ্রতিহত অভিসার।
শুনেছি বন্দী জন্তুর
চীৎকার উচ্ছৃঙ্খল,

দেখেছি কলির কুকুর
কুটিল দন্তে ছিঁড়ে খায়
দময়ন্তীর অঞ্চল।

তবু জানি আছে মন্দির,
প্রেমিক সেখানে ফিরে পায়,
হৃদয় সেখানে শঙ্খের

মতো বেজে ওঠে গম্ভীর,
স্মরণ সেখানে স্বপ্নের
সুন্দর ধূপে জ্ব'লে যায়—

রেখে যায় শুধু সময়ের
সম্ভাবনার সীমানায়
এই তৃষ্ণার তলোয়ার,

প্রাণসন্ধ্যার মন্দির,
নিয়তির মতো ক্ষমাহীন
অনতিক্রম্য শাস্তির।

[গেব্রিয়েলা মিস্ত্রাল-এর "স্বর্গ" নামক একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কোনো অখ্যাত সংকলনগ্রন্থে দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে। কবিতাটি একটি খাতায় টুকে নিয়েছিলাম—কেননা বইখানা ফিরিয়ে দিতে হবে—তারপর অনেক দিন ধ'রে তার 'ভাব' কিংবা 'আবহাওয়া'কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টার ফল কী-রকম দাঁড়িয়েছে সেটা দেখা

যাবে 'সোনালি ছায়াপথ' কবিতায়। এর মধ্যে কিছুটা আছে মিস্ত্রালের দান, কিছুটা আমার নিজের কথাও প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। একে অনুবাদ বললে ভুল হবে, বরং বলা যেতে পারে একটি থেকে আর-একটি কবিতা জন্মেছে; সাহিত্যক্ষেত্রে এ-রকম ঘটনা আমাদের অজানা নয়।

প্রায় কুড়ি বছর আগে, ডি. এইচ. লরেন্সের একটি কবিতার অনুরণনে, দ্বিতীয় কবিতাটির প্রথম পংক্তি বা প্রথম স্তবক আমার মনে এসেছিলো। সেই পংক্তিগুলোকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার ক'রে এতদিনে রক্তেমাংসে রূপ দিতে পেরে তৃপ্তি পেয়েছি। বলা বাহুল্য, এতে লরেন্সের কিছুই নেই, সেই কবিতাটিও আমার আর মনে পড়ে না এখন; কিন্তু সেই অতীতের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি ব'লে কথাটা এখানে উল্লেখ করতে ভালো লাগলো।]

একটি নক্ষত্র আসে

জীবনানন্দ দাশ

একটি নক্ষত্র আসে; তারপর একা পায়ে চ'লে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারাভরা রাতে
সে আসবে মনে হয়;—আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে!
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বরতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হতে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয়;
শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহের আলোড়নে
অঘ্রানের রাত্রি হয়;—
এ রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড়;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

রচনাকাল: ১৩৪২
(কিছু পরিবর্তিত)

দিনের পর দিন

বুদ্ধদেব বসু

দোকান

ষোলো বছর আগে, প্রথম যখন এ-পাড়ায় এসেছিলুম, তখন এর আসবাব ছিলো অন্যরকম। ঘাস ছিলো তখন, ট্রাম-লাইনের চাতাল ভ'রে, আর পথের দু-ধারে ফাঁকা-ফাঁকা মস্ত জমি, আকাশের যেখানে-সেখানে নারকোলের ঝাঁকড়া মাথা, ফুটপাতে যেখানে-সেখানে ফাল্গুনের হলদে গুঁড়ো, আর মাঠে-মাঠে জ'মে-থাকা বৃষ্টি, পিছল জল, গ্যাসের আলোয় বেগনি-সবুজ কাচের মতো, স্বপ্নের আর বীজাণুর গর্ভধারিণী।

আর মশা। হয়তো জোনাকি। আর দূরত্ব। হাটবাজার প্রয়োজনের দূরত্ব।

এখন সব বদলে গেছে। যেখানে মাঠ ছিলো সেখানে পাঁচতলা বাড়ি, ডোবার কবরের উপর রেস্তোরাঁ। গাছ কম, ঘাস মরা, ট্রাফিকের দাঁত-ঘষা চীৎকারে সভ্যতার আশ্বাস। আর পথ চলতে ঝরা পাতা ব্যাঙের ছাতা থমথমে সন্ধ্যার বদলে, এখন দোকান, ঘেঁষাঘেঁষি দোকান, অনেক, অসংখ্য, বিচিত্র, মন্ত্রীদের বক্তৃতার মতো বর্ধিষ্ণু। খাবার দোকান, সাজের দোকান, শখের দোকান; মেয়েদের গয়না, ছেলেদের খেলনা, বড়োদের খেলনা;—কোনোটি ঝকঝকে রঙিন মলাটে বাঁধানো, কোনোটি পুরোনো কবির বইয়ের মতো ফুটপাতে, কোনোটি, না-দেখা কোনো ফাঁকের মধ্যে, ম্যাজিকের মতো গজিয়ে-ওঠা। এই বন্যার মুখে একাচোরা দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ছে; যেখানে, জমিদারের বড়ো বাড়ির আব্রু বাঁচিয়ে, এতদিন ফুটপাত ছিলো নিরিবিলি, কখন সেখানে দেখা দিলো দোকান, গণতন্ত্রের হাস্যময় দাঁতের মতো সারি-সারি, দোকান।

আমি, যখন রাস্তায় বেরোই, দোকানগুলো দেখতে-দেখতে চলি। অলস সূর্যাস্ত, প্রেমে-পড়া ব্যস্ত কুকুর, সময়ের কোদাল-কোপানো রেখাবহুল জটিল

কোনো মুখ—এ-সব আমাকে উন্মন করে মুহূর্তের জন্য, কিন্তু দোকানগুলো ধ'রে রাখে আমাকে, মুগ্ধ করে, তাদের টান এড়াতে আমি পারি না।

অথচ আমি বড়ো দরের খদ্দের নই, কিংবা আমার এমনও কেউ প্রিয় নেই যার জন্য উপহারের ইচ্ছায় আমার চোখ অনবরত চঞ্চল। আমার প্রয়োজন কম, সাধ্য আরো কম, আর আমি যাকে ভালোবাসি তাকে আমি বলতে পারি না কোনোদিন।

যত সব উজ্জ্বল জিনিশ কাচের ঘরে উদ্ভিদের মতো অদ্ভুত, তাদের দিকে তাকাই না আমি; উৎসুক নারী, বলিষ্ঠ পুরুষ, যারা ঘুরে-ঘুরে সওদা ক'রে ফেরে, তাদের দিকেও না; আমি চেয়ে দেখি, চোরা চোখে যখন-তখন চেয়ে থাকি, দোকানিদের দিকেই।

হ্যাঁ, সকালে, বিকেলে, দুপুরে আমি দেখেছি তাদের, শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়; ফুটপাতে-ফুটপাতে মাসগুলির মৃতদেহ মাড়িয়ে, বছরগুলির প্রেতের ভিড় ঠেলে-ঠেলে, আমি লক্ষ্য করেছি দোকানিদের মুখ।

কী অতলস্পর্শ বিষাদ তাদের মুখে!

আপনি ভাবছেন তারা সাজিয়ে রাখে, জুগিয়ে যায়, গছিয়ে দেয়; হিশেব লেখে, টাকা গোনে, খুচরো মেলায়? কখনো আপনার মনে হয়নি আসল কথাটা? অপেক্ষা করে তারা, অপেক্ষা ক'রে থাকে: ঐ তাদের কাজ, তাদের পেশা, তাদের বৃত্তি।

কেউ আসবে ব'লে অপেক্ষা করে তারা, পরবর্তীর অপেক্ষা করে, একের পরে অন্য, একের পরে আবার, শেষ নেই, বিরামহীন—তাদের সমস্ত অস্তিত্ব এক দীর্ঘ, দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণতার সমান্তরাল।

যখন খদ্দের সওদা ঝুলিয়ে চ'লে গেছে, অন্য জন এখনো আসেনি, তখন আমি দেখেছি তাদের; কাউন্টারে কনুই রেখে, হাতের গর্তে থুতনি, তাকিয়ে আছে পথের দিকে, দূরের দিকে, ভবিতব্যের প্রগতির দিকে, ঘণ্টাগুলির লম্বা-লম্বা শিকের ফাঁক দিয়ে অনন্তকালের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যেন।

আর তাই তো তাদের চোখ এমন বিষণ্ণ, এমন অতলস্পর্শ বিষণ্ণতায় বিহ্বল।

দেখতে পান না ঐ চোখে কোনো প্রতীক, ঐ অপেক্ষমান ভঙ্গিতে কোনো প্রতিমা? সুভদ্র পাঠক, আপনারও তো দোকান আছে একটি, আমারও আছে; প্রত্যেকে আমরা যে যার মতো দোকান খুলে বসেছি, ছোটো, বড়ো, পেখম-তোলা, ঝুলে-পড়া, কোনোটি দেয়ালির মতো দীপ্ত, কোনোটি ফুটপাতে ধূমল। আমরাও অপেক্ষা ক'রে আছি, অপেক্ষা ক'রে থাকি: ছোটো থেকে বড়ো হবার জন্য, বড়ো থেকে আরো হবার জন্য, কবে চাকরি পাবো, কবে ছেড়ে দিতে পারবো চাকরি, কবে যেতে পারবো সেখানে, কবে ফিরে আসবো আবার। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু, অনবরত অপেক্ষা আমাদের, ক্লান্তিহীন, তৃপ্তিহীন, পুনরুক্তির চেতনাহীন; স্ত্রীর জন্য অন্ধকার অপেক্ষা, সন্তানের জন্য কৌতূহলী, শীত এলে গ্রীষ্মের জন্য, গ্রীষ্ম এলে বর্ষার; খ্যাতি, অর্থ, আরোগ্যের জন্য; পরিশ্রম, বিশ্রাম, পরিণাম, পরিণতি—হয়তো নিশ্চিতি, হয়তো অবসর, হয়তো হঠাৎ ভাগ্যের কোনো ইঙ্গিত—অন্ত নেই। আসবে কে, চিঠি পাবো কার, সন্ধ্যাবেলা ঘরে যখন আলো জ্বলেনি হঠাৎ কার টোকা পড়বে দরজায়? কেউ আমরা বই লিখেছি, ভাবছি কবে ছাপা হয়ে বেরোবে, কেউ ভাবছি যদি কখনো লিখতে পারি; কেউ আমরা বাড়ি তুলছি ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত-জমানো কঠিন ইটে, কেউ কাঁপছি পেনশনের আগে সেক্রেটারির ডেপুটি হবার সম্ভাবনায়। এমনি সবাই; যে যার মতো দোকান খুলে বসেছি, তাকিয়ে আছি পথের দিকে, দূরের দিকে, পরবর্তীর দিকে, আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব এক দীর্ঘ, দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণতার সমান্তরাল। কিন্তু আমরা কেউ জানি না, কেউ ভাবি না যে আমাদের এই অপেক্ষা আর-কিছুরই জন্য নয়; এই যে আমরা খুচরো গুনি, হিশেব লিখি, ব্যস্ত হই, জানলা সাজাই—এই সব অবিরল ঘণ্টাগুলির লম্বা-লম্বা শিকের ফাঁক দিয়ে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আছি আমরা, অপেক্ষা ক'রে আছি মৃত্যুর জন্য—না, তাও নয়, মৃত্যু পার হ'য়ে অমৃতের জন্য অন্তহীন অপেক্ষা আমাদের। কেননা—যদিও সংসারে তার অনেক নাম, অনেক রূপ, তবু আমাদের সব ইচ্ছাই অমৃতের জন্য আকাঙ্ক্ষা, অন্য কিছুতেই তৃপ্তি নেই আমাদের; যাকে আমরা জীবন বলি সে তো অমরতারই দুর্বল অনুকরণ; আর

যাকে বলি কাজ, চেষ্টা, ব্যস্ততা, দায়িত্ব—তাও আর কিছুই নয়, শুধু ঐ শূন্যতাকে ভুলে থাকার যে-কোনোরকম অক্ষম উপাদান—যার অবসানের জন্য মৃত্যুও যথেষ্ট নয়, যার পূর্ণতার অনন্য নাম অমৃত—সে কথা আমরা জানি আর না ই জানি।

সমালোচনা

কয়েকটি সনেট। শুদ্ধসত্ত্ব বসু। একক প্রকাশনী, কলকাতা। দেড় টাকা।

স্বয়ং 'পবিত্র সনেটগুচ্ছ' রচনা করেও জন ডান্‌ শেষপর্যন্ত কাব্যরচনার এই পেত্রার্কী পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি: 'He is a fool which cannot make one Sonnet, and he is mad which makes two'। মনে হয় চতুর্দশপদীর বেড়াজাল তাঁর কবিমনকে যথার্থ তৃপ্তি দিতে পারেনি। 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রকাশের পর এ আঙ্গিকের পুনর্নব প্রয়োগে বোধকরি প্রমথ চৌধুরীরও তেমন উৎসাহ ছিল না। কারণ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে সনেট হবে সেই জিনিস 'প্রকৃতি যাহার জেঠ, আকৃতি কনেঠ'। তাঁরই নিরুক্তি অবলম্বনে সনেটকে বলা চলে 'চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোকের' চিত্রিত সংক্ষিপ্ত প্রতীক-রচনা মাত্র। ভাবসংহতিই—অতএব বাক্‌সংযমও—এর মূলনীতি। বুদ্ধি ও কল্পনার অসামান্য সমন্বয়ের অধিকারী হয়েও এই একটি সোপানে প্রমথ চৌধুরীর পদক্ষেপ ছিল কুণ্ঠিত; স্বল্পভাষিতা তাঁর ধাতে সইত না। অনুরূপ কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে এ-আঙ্গিক এড়িয়ে গেছেন। পুরোধাস্থানীয়দের এ মনোভাব লক্ষ্য করার পর আধুনিক কালে সনেটরচনার প্রচেষ্টা মাত্রই কৌতূহল উদ্রেক করে।

'কয়েকটি সনেট'-এর মুখবন্ধে কবি লিখেছেন, আলোচ্য গ্রন্থে 'খাঁটি ইতালীয় ও ইংলণ্ডীয় সনেট লেখার পটু ও পঙ্গু চেষ্টা' বর্তমান। কিন্তু খাঁটিত্ব এবং পটুত্বের এই পূর্বঘোষিত দাবির যাথার্থ্য শেষপর্যন্ত রক্ষিত হয়নি।

পৌষ ১৩৬০

যে সংহতিগুণটি সর্বাগ্রে বিবেচ্য তা সনেটগুলিতে অল্পই চোখে পড়ল, অথচ এ গুণটির অনুপস্থিতিতে সনেট রচনার সার্থকতাই বা কী? অভ্যাসানুগত্যে দীর্ঘতর কবিতাই তো রচনা করা চলত। শুধুমাত্র মিত্রাক্ষর-বিন্যাস বা পংক্তিসজ্জার প্রক্রিয়াটুকুই পেত্রার্কীয় সনেটের শেষ কথা নয় নিশ্চয়। তাছাড়া ছন্দ আর ব্যাকরণের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পরিমিত পরিসরের মধ্যে সুচতুর, সতর্ক শব্দপ্রয়োগে সনেট রচনার যে মুনশিয়ানা—যাকে বলে craftsmanship—প্রকাশ পায় তাতেও শুদ্ধসত্ত্ব বসু শিথিলতা দেখিয়েছেন। প্রয়োগজীর্ণ শব্দের পৌনঃপুনিক অবতারণা স্বভাবতঃই বিরক্তি জাগায়। একাধিকবার ব্যবহৃত 'বৈকালীন মেঘ', 'নভোচারী পাখি' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ; কিংবা কলরব অর্থে 'রৌরব' (১৮ পৃঃ), উদ্বাহ অর্থে 'উদ্বন্ধন' (৩৩ পৃঃ)—এ ধরণের মর্মান্তিক অপপ্রয়োগ শ্রীমতী ম্যালাপ্রপ-কেও লজ্জা দেবে। কোনো কোনো কবিতায় ছন্দোভঙ্গ রীতিমতো পীড়া দেয়। শুদ্ধসত্ত্ব বসু অনেকদিন লিখছেন, তবু এ সংকলনে সুখপাঠ্য কবিতা স্থান পেয়েছে মাত্র একটি কি দুটি। নির্বাচন ব্যাপারে লেখক কি আরো নির্মম হতে পারতেন না?

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্ত

সূর্যতামসী। সম্পাদক, মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়। আট আনা।

অশোকের সময়ের গ্রাম। দুর্গাদাস সরকার। চার আনা।

কবিতাভবন প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর বই

গল্পসংকলন

লেখকের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরনের আঠারোটি ছোটো এবং বড়ো গল্প। ছোটোগল্পের কারুশিল্পে বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যাবে। রয়্যাল আকারে বোর্ডে বাঁধাই। উপহারের উপযোগী। ৫৲

সাড়া

বিখ্যাত প্রথম উপন্যাস। পরিমার্জিত সুদৃশ্য সংস্করণ। ৩৷৹

বিশাখা

একটি করুণ মধুর রসোজ্জ্বল প্রেমের কাহিনী।
মনোরম প্রচ্ছদ। ২৷৹

স্বতন্ত্র দুটি ছোটোগল্প

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ৷৹

একটি কি দুটি পাখী ৷৹

প্রতিভা বসু-র উপন্যাস

সেতুবন্ধ ২৷৹

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ
কলকাতা ২৯

KAVITA — Vol. 18, No. 2. FEBRUARY, 1954.

Yearly Rs. 4/-, or 6S. 6d.
Per Copy Rupee 1/-

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202, Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India.
Editor and Publisher : ***BUDDHADEB BASU***
Printed by Prativa Art Press, 115A, Amherst St., Calcutta-9.